মৎস্যকন্যা

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

আশ্বিন, ১৪২৯

বিশেষ মালাউই সিকলিড সংখ্যা

সম্পাদক

অরিত্র ভট্টাচার্য্য

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

সৌম্য সরকার, পবিত্র পাল, শুভদীপ দাস,
জ্যোতির্ময় রায়, সঞ্জীব পাত্র, অভীক ঘোষ

প্রচ্ছদ

পবিত্র পাল

প্রকাশক

অর্জন বসু রায়

মুদ্রণ

বর্ণনা প্রকাশনী

৬/৭, বিজয়গড় কলকাতা-৭০০০৩২

দূরভাষ: ৯৮৭৪৩৫৭৪১৪

মেছোবই

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৪২৯

সূচীপত্র

তারাদের হ্রদ • পবিত্র পাল

আফ্রিকান সিকলিড আর বিবর্তনের ধোঁয়াশা
•
সৌম্য সরকার

হ্রদের নীচে দৈত্য-দানব • অভীক ঘোষ

পাথুরে মাছের পাঁচালী • সঞ্জীব পাত্র

মালাউই সিকলিডদের রাখার সহজপাঠ
•
অরিত্র ভট্টাচার্য্য

আফ্রিকান সিকলিড চর্চার জনক ডেভিড লিভিংস্টোন
•
শ্রয়ণ ভট্টাচার্য্য

আমার প্রিয় মেইসন রিফ
•
তথ্যপ্রিয় দাস

মাছচিত্র
•
শ্রীদীপ্ত মান্না

আগামীর মেছো

জঙ্গলমহলের মৎস্যমঙ্গল
•
রাকেশ সিংহ দেব

ছোটনাগপুর এবং এক অজ্ঞাতকুলশীলের গল্প
•
সপ্তর্ষি মুখার্জি

প্লান্টেড ট্যাঙ্কের সার-বত্তা
•
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

সম্পাদকের কথা

পুজো আসছে!! উৎসবপ্রিয় আপামর বাঙালীর থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় রোজনামচায় এই শব্দবন্ধের আনন্দ বোধহয় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পুজোর সাথে সাথে এতোগুলো চিত্রকল্প আমাদের মনে ভীড় করে আসে যাদের থেকে বেশী কার্যকরী ভালোলাগার টনিক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আর গত বছর থেকে শখের মাছপুষিয়েদের ও প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে পুজোয় আনন্দের নতুন যে অনুসঙ্গ যোগ হয়েছে তা হলো বাঙলা ভাষার একমাত্র মাছ ও জলজ প্রকৃতি সংক্রান্ত ই-ম্যাগাজিন 'মেছোবই'। এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য মায়ের আগমনী বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে 'মেছোবই'। ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে গড়িয়েছে অনেক জল, অতিমারীক্লিষ্ট পৃথিবী হয়ে উঠেছে আর একটু সুস্থ, সুন্দর, আর সাথে সাথে বেড়েছে মৎস্যপ্রিয় পাঠকদের মধ্যে 'মেছোবই'; এর কদর। আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায়, শ্যামা পূজার মন্ডপে ঠাঁই পাওয়ার সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষ আপন করে নিয়েছেন 'মেছোবই' কে। কেউ তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন নিজের চেনা আশপাশের প্রকৃতিকে, কেউ পেয়েছেন সচেতনতার বার্তা, কেউ বা আবার নতুন কোনো অ্যাকোয়ারিয়াম করার প্রেরণা। সাহিত্যে একটা দাঁতভাঙ্গা থিওরি আছে জানেন তো, যার পোষাকি নাম 'রিডার্স রেসপন্স থিওরি'। সহজ বাঙলায় বলতে গেলে সেই থিওরিতে বলা আছে লেখার আসল মানে বের করেন পাঠকরাই। লেখকের কাজ লেখা, আর সেই লেখা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পাঠকের কাছে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়, সেখানেই তার সার্থকতা। 'মেছোবই'এর ক্ষেত্রেও এই কথা অনেকাংশে সত্যি। আর পাঠকদের এই ভালোবাসা, চাহিদাই 'মেছোবই'; এর এগিয়ে যাওয়ার জ্বালানী। আর সেই জন্যই আমরা এই মূল্যবৃদ্ধির, জি.এস.টি-র বাজারেও বিনামূল্যে চেষ্টা করে যাচ্ছি 'মেছোবই'; বিভিন্ন ধরণের লেখার মাধ্যমে আমাদের মাতৃসমা প্রকৃতিকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার সচেতনতা গড়ে তোলার। আর এই কাজে প্রতিবারই এগিয়ে আসেন আমাদের কিছু সহৃদয় শুভানুধ্যায়ীরা যারা আর্থিক অনুদান, বিজ্ঞাপনদানের মাধ্যমে এই উন্নত মানের পত্রিকার প্রকাশ সংক্রান্ত খরচ বহন করতে অনেকটা সাহায্য করেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আমরা তাই আমাদের সকল অনুদানকারী এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আপনারা আমাদের হাত ধরেন বলেই আমরা অনেকটা নিশ্চিন্তে 'মেছোবই'কে আরো উন্নত মানের পত্রিকা করে তুলতে চেষ্টা করতে পারি। আর সাথে সাথে সকল পাঠকদের কাছেও আমাদের অনুরোধ 'মেছোবই'; ভালোলাগলে তাঁরা যেন যতোটা সম্ভব এই ই-ম্যাগাজিন ছড়িয়ে দেন নিজেদের চেনা পরিমন্ডলে। তাতে আমাদের বিজ্ঞাপনদাতারাও উৎসাহ পান।

আমাদের পুজো সংখ্যায় গত দুই বারের মতোই থাকছে আমাদের পরিচিত 'মাছ-চিত্র', 'আগামীর মেছো';র মতো বিভাগ। কিন্তু পুজোয় সব কিছুই যখন নতুন সাজে সেজে ওঠে তখন আমাদের প্রিয় 'মেছোবই'এ নতুন কিছু যোগ হবে না তা কি হয়! তাই এবারের পুজো সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ হলো মালাউই সিকলিড। শখের মাছপুষিয়েদের কাছে আফ্রিকার মালাউই হ্রদের নাম অতি পরিচিত তার মাছ-বৈচিত্র্যর কারণে। শ্যাওলাভোজী ছোট আকারের মবুনা থেকে শিকারী বৃহদাকার হ্যাপ, কি নেই সেখানে! আর এদের বিচিত্র উজ্জ্বল রঙ আর ব্যবহারে মুগ্ধ হন না এরম মাছ প্রেমী খুব কমই আছেন। আর মুগ্ধ হলেই ইচ্ছে জাগে তাদের নিজের ঘরে কাঁচবাক্সে এনে রাখার। আর সেটা ঘিরেই তৈরী হয় অজস্র প্রশ্ন - এদের রঙ এতো সুন্দর কিভাবে, এরা যেখানে থাকে সেখানের পরিবেশ কিরকম, কোন কোন ধরণের মাছ থাকে লেক মালাউই তে, আর এদের রাখতে গেলে রাখবোই বা কিভাবে! শখের রঙিন মাছ পুষিয়েদের জগতের অন্যতম জনপ্রিয় প্রজাতির সম্পর্কে এরম হাজারো কৌতূহল চরিতার্থের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই বিশেষ প্রয়াস। আশা করবো এই পুজো সংখ্যা আপনাকে দেবে নিজের ড্রয়িং রুমে দ্বিধাহীনভাবে একটুকরো মালাউই হ্রদ এনে রাখার সুযোগ এবং সাথে সাথে আফ্রিকার অন্যতম জীববৈচিত্র্য পূর্ণ একটা হ্রদকে আরো একটু কাছ থেকে চেনার সুযোগও।

এর সাথে তো রয়েইছে বিভিন্ন স্বাদের একাধিক লেখা যা আমাদের 'মেছোবই'এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সব মিলিয়ে এবারের পুজো সংখ্যা হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যের মাঝে এক টুকরো আফ্রিকা। অবশেষে প্রতিবারের মতো এবারেও বলি, আমাদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ আপনাদের জন্য, তাই আপনাদের ভালোলাগা-মন্দলাগা সমস্তটাই আমাদের নির্দ্বিধায় জানাবেন আমাদের গ্রুপ 'পাইরেটস ডেন'এর পাতায় অথবা আমাদের অফিসিয়াল ওয়েব সাইট www.piratesden.in এ। আমাদের সম্বল এই যাত্রাটুকুই আর তাই চাহিদা হলো সহযাত্রীর সাহচর্য মাত্র। পুজো সবার আনন্দে কাটুক, 'মেছোবই'এর সাথে কাটুক।

অ্যাডমিন এবং মডারেটর
পাইরেটস ডেন

আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নং - 9903569935, 9333150179, 9679747900

গৃহ amore

A Hub Of Creamless Cake

Contact:- 9593680132

For Lovely Cream-less Cakes

in any Occasion or Celebration,

Contact "Griho-amore",

Contact no : 9593680132

।। তারাদের হ্রদ।।

পবিত্র পাল

ধরুন বহুদিন কাজকর্মের চাপে দম ফেলার ফুরসত পান না, বহুদিন এভাবে চলতে চলতে বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছে। তারপর দেখলেন হঠাৎ করে সপ্তাহের শেষে তিনদিনের ছুটি পেয়ে গেলেন, অনেকদিন কোথাও যাওয়া-টাওয়া হয় না, দী-পু-দা ফি-পু-দা করে করে থোর-বড়ি-খাড়া হয়ে গেছে। ইচ্ছে করছে টুক করে কোথাও ঘুরে আসি, চললেন একটা গাড়ি নিয়ে সোজা সিডনি কিংবা পার্থ, টুক করে দেখে এলেন একটা বিগ ব্যাশের ম্যাচ। তেমনিভাবেই কেউ দেখা গেল নিউইয়র্ক থেকে বাস ধরে ঘন্টা তিনেকের মধ্যে কেউ চলে গেল এডিনবরা, ব্রাজিল থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে আফ্রিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। কি? ভাবছেন কিসব আবোলতাবোল বলছি? আরে মশাই ভাবতে যতোই আবোলতাবোল লাগুক না কেন, এগুলো কিন্তু জাস্ট একটুর জন্য হলো না! হ্যাঁ, জাস্ট একটুর জন্য!

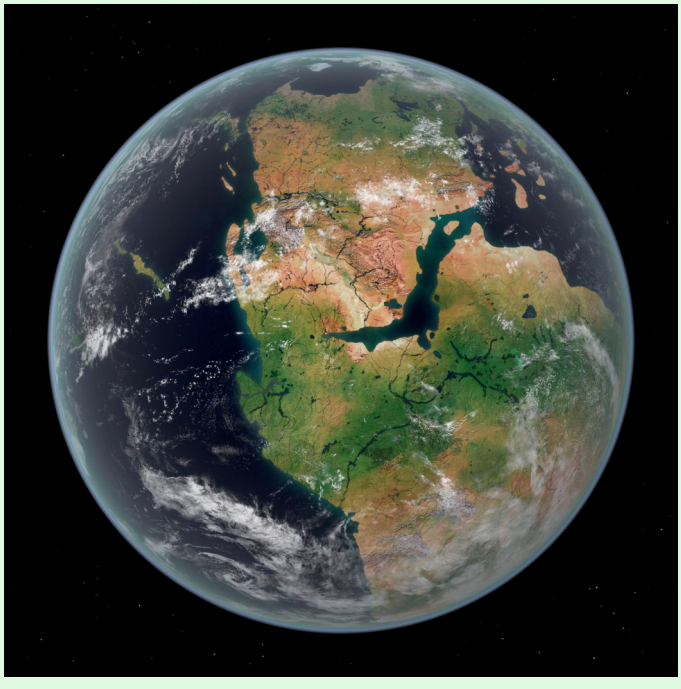

তখনকার পৃথিবী এবং একক মহাদেশ 'প্যানজিয়া'

তবে আর বলছি কি! ছিল,ছিল, সব একসাথে ছিল আজ থেকে সাড়ে তিনশো মিলিয়ন বছর আগে সবকটা মহাদেশ একসাথে ছিল। তখন ভারতের পাশে আন্টার্কটিকা ছিল, আফ্রিকার পাশে দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপের পাশে ছিল উত্তর আমেরিকা। সব মিলিয়ে তখন পৃথিবীজুড়ে একটাই মহাদেশ ছিল, যাঁর নাম ছিল প্যানজিয়া এবং সেই মহাদেশকে ঘিরে একটাই মহাসাগর ছিল যার নাম প্যানথালাসা। তখন টুক করে এদেশ, ওদেশ, মহাদেশ করে নেওয়ার চান্স ছিল। তবে মুশকিল হচ্ছে সেময় তো আর মানুষ ছিল না! যাইহোক একদিন কালের নিয়মে সেই বিশাল মহাদেশ ভাঙলো, ভেঙ্গেচুরে খন্ড খন্ড হয়ে ভাঙ্গা অংশগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। তখন কারও নাম হল ইউরেশিয়া, কেউ আফ্রিকা, কেউ বা আমেরিকা। মহাসাগরগুলোও একই ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। নতুন নতুন সব মহাদেশ-মহাসাগর তৈরি হল। এভাবেই লক্ষ-কোটি বছর ধরে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো ক্রমাগত নিজেদের জায়গা বদল করে চলেছে। পরিবর্তন হচ্ছে তাদের আকার আকৃতি। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সব

আফ্রিকা মহাদেশের ভাঙনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে গ্রস্থ উপত্যকা,
যা পরবর্তীকালে হয়ে উঠতে পারে নতুন মহাসাগর।

মহাদেশ আর মহাসাগর। পাহাড় পর্বত, সমুদ্র সাগরের কত কিছুই না তৈরি হচ্ছে আবার হারিয়েও যাচ্ছে কত কিছু।

আচ্ছা এরকম যদি হত আমাদের চোখের সামনেই কোন মহাদেশ তৈরি হতো! যদি তৈরি হতে দেখতে পেতাম নতুন কোন মহাসাগর! তবে কেমন হতো? মন্দ হতো না কি বলুন ? ইচ্ছে হয়? তবে দেখবেন নাকি ? বেশ তাহলে আর দেরি কেন চলুন যাই নেকড়ে বিহীন মহাদেশ 'আফ্রিকা'।

আফ্রিকার পূর্ব দিকে যেখানে সোমালিয়া আর ইথিওপিয়া দেশ সেইখান থেকেই শুরু হচ্ছে নতুন মহাদেশ তৈরির যাবতীয় কর্মকাণ্ড। ইয়া বড় এক ফাটল তৈরি হয়েছে সেখানে। সেই ফাটল নীল নদের দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত হয়ে চলেছে একেবারে মোজাম্বিক দেশের উপকূল পর্যন্ত। যা দু টুকরো করে ফেলেছে আফ্রিকা মহাদেশকে। পশ্চিমের আফ্রিকা (নুবিয়ান প্লেট) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যেতে চাইছে পূর্বের আফ্রিকা (সোমালি প্লেট)। আফ্রিকা ভেঙে জন্ম নিচ্ছে নতুন এক মহাদেশ। আর মাঝের জায়গাটা নীচু হয়ে বসে যাচ্ছে। একেই বলে আফ্রিকার গ্রেট রিফটভ্যালি। ভবিষ্যতে দুটো আফ্রিকা মহাদেশ দুরে সরে গেলে এখানেই তৈরি হবে নতুন মহাসাগর। তবে সেসব হতে অনেক সময় লাগবে, কয়েক মিলিয়ন বছর। ততদিন এখানে বারংবার ভূমিকম্প হবে, কখনো কখনো অগ্নুৎপাত হবে, নীচু জায়গাগুলোতে জল জমে অনেক ছোটবড় হ্রদ তৈরি হবে। ঠিক যেমন এডওয়ার্ড, আলবার্ট, কিভু, টুরকানা, টাঙ্গানিকা, মালাউই এরকম সব অজস্র হ্রদ। এইসব জানা-অজানা হ্রদের মাঝে মধ্যে মালাউই কিন্তু একটি বেশ বিখ্যাত এবং উল্লেখযোগ্য রিফট ভ্যালি হ্রদ যার উৎপত্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৮৬ লক্ষ বছর আগে। অতএব বলাই চলে মালাউই বেশ প্রাচীন হ্রদ। মোটামুটিভাবে ৪০-৪৫ লক্ষ বছর আগে এর গভীরতম

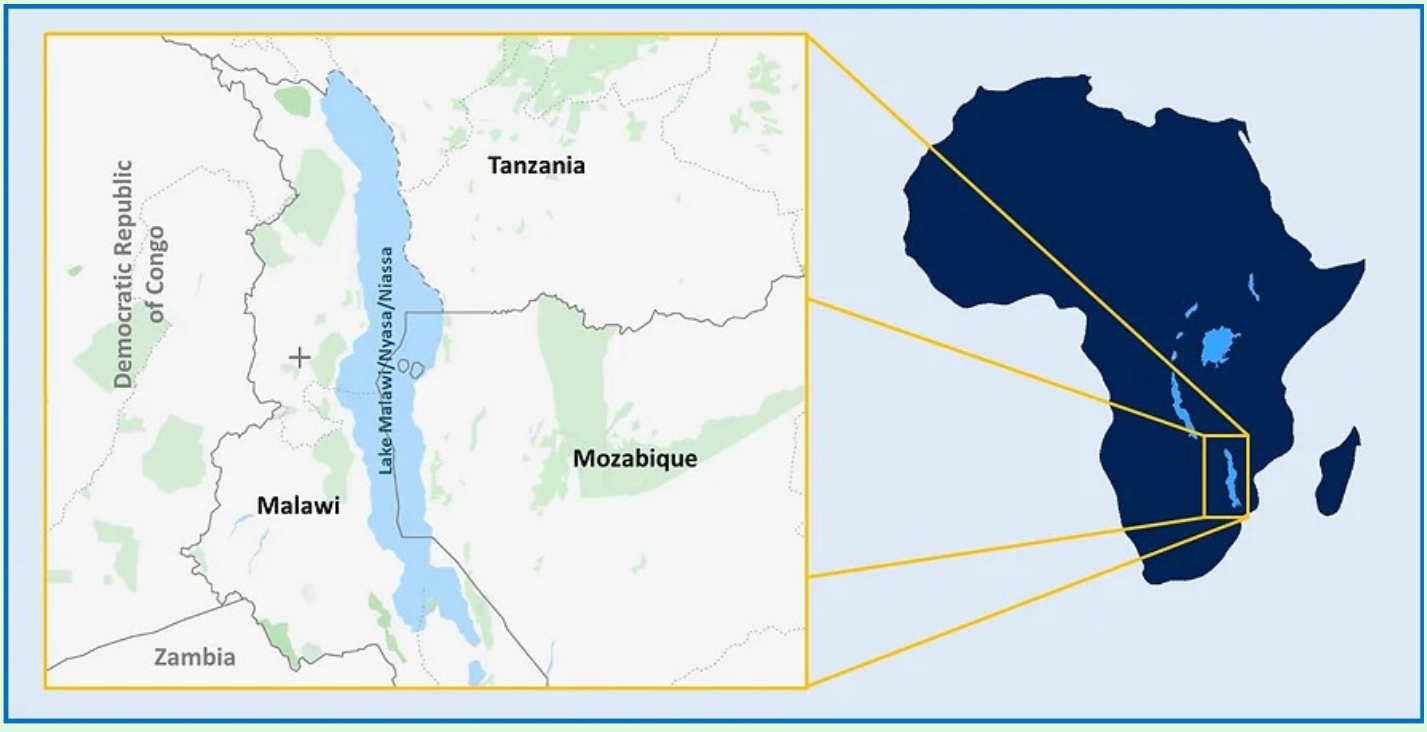

আফ্রিকার মানচিত্রে মালাউই হ্রদ

অংশগুলোতে জল জমা শুরু হয়েছিল। তবে মালাউই তো শুরু থেকেই আজকের মতো একই রকম অবস্থায় ছিল না, কখনো এর জলতল বেড়েছে কখনো প্রায় পুরোটাই শুকিয়ে গেছে, জল শুকোতে শুকোতে বিচ্ছিন্ন অ্যালকাইন লেকে পরিণত হয়েছে, আবার নতুন করে জল এসে ভর্তি হয়েছে। তবে আজ আমরা মলাউই হ্রদের যে অবস্থা দেখতে পাই সেই অবস্থা মোটামুটিভাবে ষাট হাজার বছরের পুরনো। অর্থাৎ মালাউই একটি প্রাচীন হ্রদ হলেও তার বর্তমান অবস্থাটি কিন্তু বয়সে বেশ নবীন, অথব এই নবীন হ্রদেই জীববৈচিত্র্য কিন্তু অবাক করে দেওয়ার মতো। কারণ এখানেই বসবাস করে অজস্র প্রজাতির সিকলিড। এদের বেশিরভাগই এন্ডেমিক। অর্থাৎ এই হ্রদ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এদের পাওয়া যায় না। কমবেশি হাজার খানেক প্রজাতির সেইসব সিকলিডের উৎপত্তি নাকি মাত্র একটি বা দুটি প্রজাতি থেকে। যাঁদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এরা অসম্ভব রঙিন এবং অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পুষিয়েদের কাছে এরা তুমুলভাবে জনপ্রিয়। তবে সে প্রসঙ্গে যাবো তার আগে আমরা টুক করে জেনে নিই মালাউই হ্রদের বিশেষত্বই বা কি, কেনই বা এই হ্রদ এতো স্পেশাল? কিভাবে এই হ্রদ আবিষ্কার হল? সেসব জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৮৭১ সালের নভেম্বর মাসে, আফ্রিকার দেশ তানজানিয়ার উজিজি শহর। এই শহরে বসবাস করছেন একজন অকালবৃদ্ধ সাদা চামড়ার প্রৌঢ়। প্রৌঢ় জাতিতে ইংরেজ। কিন্তু আফ্রিকার কালো মানুষের সাথে মিশে গিয়েছেন, চামড়ার রঙে নয়, ভালোবাসায়। ভালোবেসে ফেলেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এই মহাদেশটাকে। দাস ব্যবস্থা যখন ভিতর থেকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে এই মহাদেশের সহজ সরল মানুষগুলোকে, তখন তিনি ব্যাথিত হচ্ছেন। তিনি আর ফিরতে চান না তাঁর চেনা ইউরোপীয় সভ্য জগতে। বছর কয়েক আগেই স্ত্রীকে হারিয়েছেন, সেটাও এই আফ্রিকার বুকেই। তাই আর জীবনের বাকি দিনগুলোতে তেমন কোন আকর্ষণ নেই। শেষ ছয় বছর যোগাযোগ রাখেননি ইউরোপীয় কারোর সাথে। তবুও কিন্তু তাকে কেউ ভুলে যায় নি। যাবেই বা কিভাবে? ইনি তো যে সে কেউ নন, স্বনামধন্য চিকিৎসক, নিবেদিতপ্রাণ ধর্মপ্রচারক, এবং বিখ্যাত অনুসন্ধানকারী। মাত্র বছর পনেরো আগেও যাঁকে নিয়ে ব্রিটেনে ছিল তুমুল উত্তেজনা। রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁকে দিয়েছিল সোনার মেডেল। তিনি ছিলেন ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত। যাঁর লেখা ছাপানোর জন্য প্রকাশকরা দুশো গিনি পর্যন্ত অগ্রিম পারিশ্রমিক দিতে দ্বিধাবোধ করতো না। বিখ্যাত অভিযাত্রীর লেখা সেই ভ্রমণ কাহিনী বিক্রি হতো হাজারে হাজারে। তেমন একজন মানুষ যখন ইউরোপে থেকে আফ্রিকা গিয়ে উধাও হয়ে গেল তখন তো আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। এটা একটা বড় স্টোরি তো বটেই। অন্ততঃ নিউইয়র্ক হেরাল্ডের মতো স্বনামধন্য সংবাদপত্রের কাছে তো বটেই। তাই তাদেরই উদ্যোগে আরেক স্বনামধন্য অভিযাত্রী হেনরি মর্টন স্ট্যানলিকে আফ্রিকায় পাঠানো হলো তাঁর অনুসন্ধানে। দু বছর খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে স্ট্যানলি এসে পৌঁছেলেন উজিজি শহরে। সেই পৌঢ়কে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, Dr. Livingstone, I presume পৌঢ় ছোট্ট উত্তর দিলেন 'Yes' তারপর জুড়লেন– 'I feel thankful that I am here to welcome you.' আফ্রিকার ইতিহাসের বিখ্যাত সংলাপ। দুই শ্রেষ্ঠ আফ্রিকান অভিযাত্রী একে অপরের সাথে মিলিত হলেন। আসলে কে এই ড. ডেভিড লিভিংস্টোন? মালাউই হ্রদের আবিষ্কর্তা! হ্যাঁ ইনিই প্রথম অ-আফ্রিকান যিনি জরিপ করেছিলেন মালাউই হ্রদের দক্ষিণ দিকটা। ইনিই আবিষ্কার করেছিলেন ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত (১৮৫৫) ইনিই প্রথম মানচিত্র তৈরি করেছিলেন জাম্বেজি নদীর অববাহিকার, ইনিই প্রথম শ্বেতাঙ্গ যে হার্ট অফ আফ্রিকা থেকে সমুদ্রতট পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা খুঁজেছিলেন! এহেন মহান অভিযাত্রী মালাউই হ্রদটিকে দিয়েছিলেন একটি সুন্দর নাম দিয়েছিলেন 'লেক অব স্টারস' অর্থাৎ তারাদের হ্রদ। সত্যিই তো তারাদের হ্রদ! প্রায় ত্রিশ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটারের এই বিশাল হ্রদ যেন মহাদেশের মধ্যে একটি সমুদ্র। রাতের বেলা হ্রদের স্বচ্ছ কালো জলের উপরে জ্বলে ওঠে জেলেদের নৌকার অজস্র লণ্ঠন। ঠিক যেমন আকাশ জুড়ে ফুটে ওঠে অজস্র তারা। সেই লণ্ঠনের আলোয় স্নান করে আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম হ্রদ।

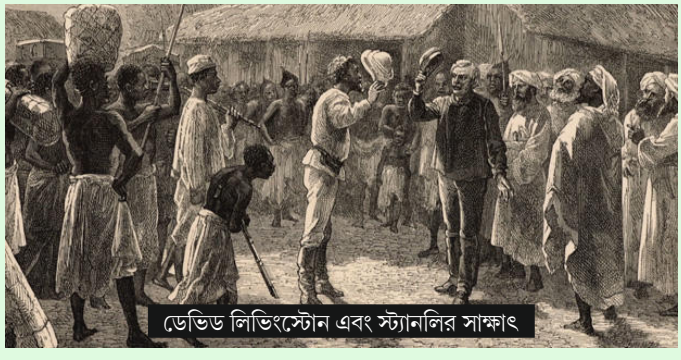

ডেভিড লিভিংস্টোন এবং স্ট্যানলির সাক্ষাৎ

মালাউই হ্রদের জলের নিচে

আসলে মালাউইর জল স্বচ্ছ। এতোটাই স্বচ্ছ জলের নীচে ২০ মিটার পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। আসলে এই স্বচ্ছতার রহস্য হচ্ছে মালাউই আসলে মিরোমিক্টিক (Meromictic) হ্রদ। মানে এই হ্রদের বিভিন্ন ঘনত্বের জলের স্তরগুলো কখনোই একে অপরের সাথে মেশে না। ফলে এই হ্রদে বিভিন্ন প্রজাতির মাছগুলো বিভিন্ন গভীরতায় জলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সাথে মানিয়ে নিয়ে বসবাস করে। একই হ্রদে বসবাস হলেও এদের নিয়ে আলাদা। জীবন বিকাশের দিক থেকে এটি চমকপ্রদ ঘটনা বটেই। তাছাড়া এই হ্রদের জলে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি। সাধারণ সুপেয় জলের হ্রদগুলি থেকে গ্রেট রিফট ভ্যালি অঞ্চলের হ্রদগুলির জলের ক্ষারকীয়তা এবং ঘনত্ব এমনিতেই বেশি হয়। কারণ অতীতে এইসব হ্রদগুলির বারবার শুকিয়ে যাওয়া এবং এই অঞ্চলের শিলা-মৃত্তিকা ধুয়ে ধুয়ে আসা খনিজ পদার্থ গুলির নিরন্তর হ্রদের জলে মিশতে থাকা হ্রদগুলির জলের ঘনত্ব ও ক্ষারকীয়তা বাড়িয়ে দেয়। ফলে এখানে বসবাসকারী মাছেরা একটি ব্যতিক্রমী জলীয় অবস্থার মধ্যে বসবাস করে যা আশেপাশের হ্রদগুলির ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সেই কারণেই এক অনন্য প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য মালাউই হ্রদে অনন্য সব প্রজাতির মাছেরা বসবাস করে, যাদের মালাউই হ্রদ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও প্রাকৃতিক ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে প্রাকৃতিকভাবে দেখা না গেলেও এই হ্রদের সিকলিড কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর প্রতিটি কোণায়, সর্বত্র সব অ্যাকোয়ারিয়ামে। মেছো হবির লোকেদের কাছে মালাউইর সিকলিডরা তুমুল জনপ্রিয়। রঙের বাহারে এবং আচার আচরণে এরা অদ্বিতীয়। হ্যাপলোক্রোমিস ও মবুনা গোত্রের মাছেরা পৃথিবীজুড়ে 'সেলিং লাইক হট কচুরিস'। তবে এই জনপ্রিয়তার একটা আশঙ্কার দিকও আছে। যেহেতু এই হ্রদের মাছেরা এন্ডেমিক প্রজাতির অর্থাৎ এই হ্রদ ছাড়া পৃথিবীর আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না তাই মালাউই হ্রদ থেকে যথেচ্ছভাবে মাছ ধরে বিদেশে রপ্তানি করলে অচিরেই এই হ্রদের জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হতে বাধ্য। তাই হ্রদ তীরবর্তী তিনটি দেশ তানজানিয়া, মোজাম্বিক এবং মালাউই (হ্রদের নামেই দেশ) সরকার এদের সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। ২০১১ সালে এই হ্রদ এবং হ্রদের তীরবর্তী এলাকাকে 'রামসার সাইট' হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণের জন্য যা এক মহতী পদক্ষেপ। আসলে আমরা যাঁরা মাছ ভালোবাসি তাদের কাছে তাদের কাছে মালাউই হ্রদ যেন রঙিন মাছের আকাশে এক ধ্রুবতারা। যেখানকার মাছ কোনও না কোন সময় আমাদের এই শখটাকে দিশা দেখিয়েছে , তাই আমরা চাই ভালো থাকুক মালাউই, ভালো থাকুক মালাউইর জানা অজানা অজস্র সিকলিড। আকাশের তারার মতোই উজ্জ্বল হোক মালাউইর ভবিষ্যৎ।

ছবি: ইন্টারনেট

KRISHNA
KRISHNA GROUP OF COMPANIES

INTRODUCING HEALTHY SALT

NOW AVAILABLE ON

amazon

Flipkart

With fresh flavours and essential minerals

Call us @ 93301 92019

Follow us :

www.krishnasalts.com

।। আফ্রিকান সিকলিড আর বিবর্তনের ধোঁয়াশা ।।

সৌম্য সরকার

মাছ পুষিয়েদের দুনিয়ায় আফ্রিকান সিকলিডরা একরকম সেলিব্রেটি। যেমন তাদের রং, তেমন অবাক করা হাবভাব। দুনিয়াজোড়া কদর হবে না-ই বা কেন! আর শুধু শখের মেছোদের কথা কেন বলি, বিশ্বজোড়া তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীকুল চোখ কপালে তুলেছে তাদের এই বিবিধতা, এই প্রাচুর্য দেখে। আফ্রিকার সিকলিডদের এই বিবর্তনের যুতসই ব্যাখ্যা দিতে তাদের হাতড়াতে হয়েছে নানান তত্ত্ব নানান মতবাদ। স্বয়ং ডারুইন সাহেবের সাথে পূর্ব আফ্রিকার রিফট ভ্যালি সিকলিডদের পরিচয় থাকলে গ্যালাপাগোস ফিঞ্চদের এই কৌলীন্য থাকতো কিনা সন্দেহ আছে! আজ একটু ঘেঁটে দেখা যাক আফ্রিকার সিকলিডদের বিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানীদের নানা তত্ত্ব।

এমনিতেই মাছেদের এই সিকলিড পরিবার প্রজাতি প্রাচুর্যে অন্য যেকোনো মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পরিবারকে অনায়াসে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। আড়াই হাজারেরও বেশি প্রজাতির মাছের সহাবস্থান এই সিকলিড পরিবারের ছাতার তলায়। যারা ছড়িয়ে আছে তিন মহাদেশ আমেরিকা, আফ্রিকা আর এশিয়া জুড়ে। যদিও প্রজাতি সংখ্যায় আমেরিকা কিংবা আফ্রিকার তুলনায় এশিয়ার সিকলিড প্রজাতির প্রতিনিধি প্রায় নগন্য, মাত্র তিনটি। তবে বলার মতো বিষয় হল, সেই তিনটিরই বাসস্থান আমাদের দক্ষিণ ভারত আর লাগোয়া সিংহলের উপকূল বরাবর।

তবে পূর্ব আফ্রিকার রিফট ভ্যালি সিকলিডদের প্রাচুর্যের তুলনা মেলা ভার। অভিযোজনগত বিকিরণ বা Adaptive radiation-এর এক আশ্চর্য নিদর্শন তারা। একটা ইকোসিস্টেমের প্রায় প্রতিটি niche কে ব্যবহার করার চেষ্টায় দেহের গড়ন, রং, আচরণ প্রতিটি অভিযোজিত হয়েছে প্রয়োজনের নির্দিষ্ট ছাঁচে। কেউ খাদ্যর প্রয়োজনে শুধুমাত্র পাথরের গায়ে হয়ে থাকা শ্যাওলার ওপর নির্ভরশীল। তাদের দাঁতের গঠনও সেই ধাঁচে গড়ে উঠেছে। আবার কারো চোয়াল সেজে উঠেছে তীক্ষ্ণ দাঁতে। স্বভাবতই ছোট জলজ পোকা এমনকি ছোট অন্য সিকলিডরা তাদের খাদ্যতালিকায় প্রধান জায়গা পাচ্ছে। আবার কেউ কেউ ঝোপ বুঝে কোপ মারা শিকারী, Ambush predator যাকে বলে। তাদের আবার চোয়াল বেশ লম্বা আর কয়েক ভাঁজে ভাঁজ করা। চাইলেই মিলিসেকেন্ডের ব্যবধানে চোয়ালের ভাঁজ খুলে হতবাক শিকারকে আত্মসাৎ করার এক মোক্ষম অস্ত্র। অন্যান্য দিকে ভুলে গিয়ে শুধু এরকম খাবারের পছন্দের ওপর অভিযোজেনের হিসেব কষলেই উদাহরণের তালিকাটা বেশ দীর্ঘ করা যায়।

এর পর আছে সমান্তরাল বিবর্তন বা Parallel evolution এর গল্প। বিবর্তনের মজার খেলায় অভিযোজনের একই ধারা বারবার ফিরে এসেছে সম্পূর্ণ আলাদা জায়গার প্রজাতিদের মধ্যে। একটা উদাহরণ দিলে হয়তো কিছুটা বোঝা যাবে। এই উদাহরণটাও না-হয় খাবার দিয়েই হোক। পূর্ব আফ্রিকার রিফট ভ্যালির প্রধান তিনটে হ্রদ ট্যাঙ্গানিকা, মালাউই আর ভিক্টোরিয়া তিনটিতেই এমন কিছু সিকলিড প্রজাতির দেখা মেলে যাদের খাবার কেবলমাত্র অন্য মাছেদের আঁশ। আর তাই এই সবকটা মাছেরই দাঁত কিছুটা কাঁটাদার নিড়ানির মতো, যাতে সহজেই এদের কবলে পড়া মাছেদের গা থেকে আঁশ ছাড়ানো যায়। অবশ্য বিবর্তন এখানেই থেমে থাকেনি, এদের চোয়াল অভিযোজিত হয়েছে অসমঞ্জস ভাবে। কারো কারো চোয়াল বেখাপ্পা ভাবে বাঁদিকে বেঁকানো আবার কারো বাঁকানো ডানদিকে। বামপন্থী আঁশখেকোরা শিকারকে আক্রমণ করে ডানদিক থেকে আর ডানপন্থীরা করে ঠিক তার উলটো। প্রাকৃতিক নির্বাচন অন্তত দুই পন্থীদেরই সমান মান্যতা দিয়েছে। অদ্ভুত ভাবে রিফট ভ্যালির তিন হ্রদেই ভিন্ন জাতিজনির সিকলিডদের মধ্যে এই একই

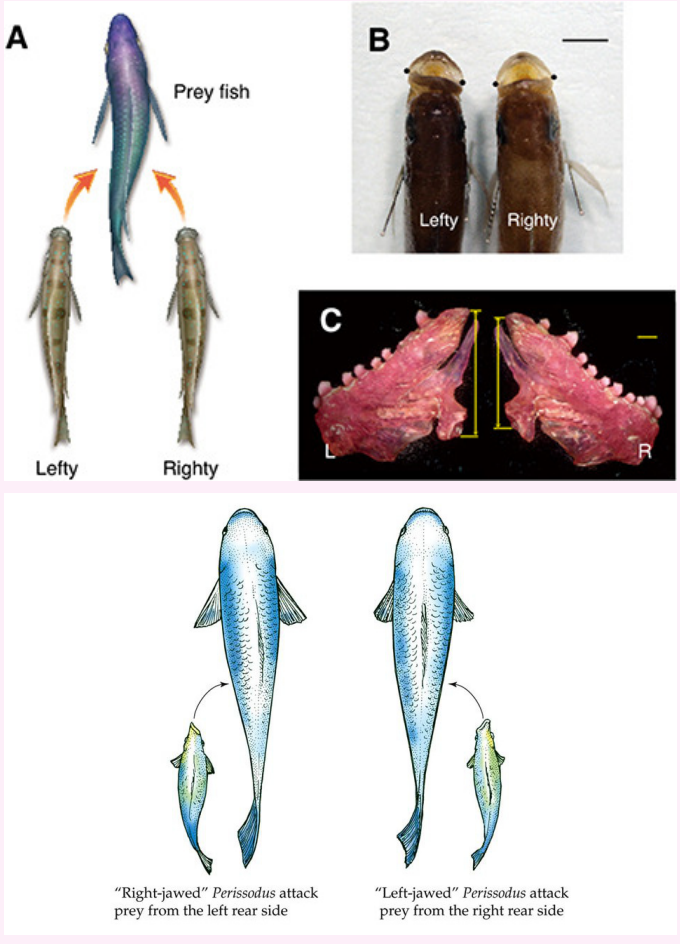

লেক ট্যাঙ্গানিকার আঁশখেকো *Perissodus* sp এর বামপন্থী আর ডানপন্থী চোয়ালযুক্ত মাছেদের আক্রমণের পদ্ধতি আর চোয়ালের অন্তর্গঠনের পার্থক্য।

অভিযোজনের পুনরাবৃত্তি হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। একই রকম উদাহরণ দেওয়া যায় অধিকাংশ রিফট ভ্যালি সিকলিডের দেহের ওপর গাঢ় উল্লম্ব দাগগুলো নিয়ে। মনে করা হয় এই দাগগুলো এদের আলাদা সুবিধা দেয় শিকারীর নজর থেকে লুকিয়ে আসেপাশের পাথরের রঙের সাথে মিশে আত্মগোপন করতে। অন্যদিকে যে সমস্থ শিকারী সিকলিডরা জলে দ্রুত গতিতে সাঁতরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনো হতভাগ্য শিকারের ওপর তাদের গায়ের ওপর কালো দাগগুলো হয়ে গেছে অনুভূমিক বা মাথা থেকে লেজের দিকে, যা এদের সাহায্য করে সম্ভাব্য শিকারের ঘেটি কামড়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত নিজেকে লুকিয়ে রাখতে।

এর সাথে সাথেই রিফট ভ্যালি সিকলিডদের এই অভিযোজনের চরম বিভিন্নতা কি নির্দিষ্ট অভিযোজনের সমান্তরাল বিবর্তন কয়েকটি বুনিয়াদি প্রশ্নকেও উসকে দিচ্ছে। ধরা যাক সিকলিডদের খাবারের এই যে চূড়ান্ত স্পেসালাইজেশন যা একেকটি দলের সিকলিডদের খাদ্যতালিকাকে বড়ই সীমিত গণ্ডিতে বেঁধে রেখেছে। এই সীমিত খাদ্যতালিকায় যদি কখনো ভাটা আসে তবে তার বিকল্প খাদ্য খোঁজার বিশেষ সুযোগ থাকবেনা। তাহলে এই

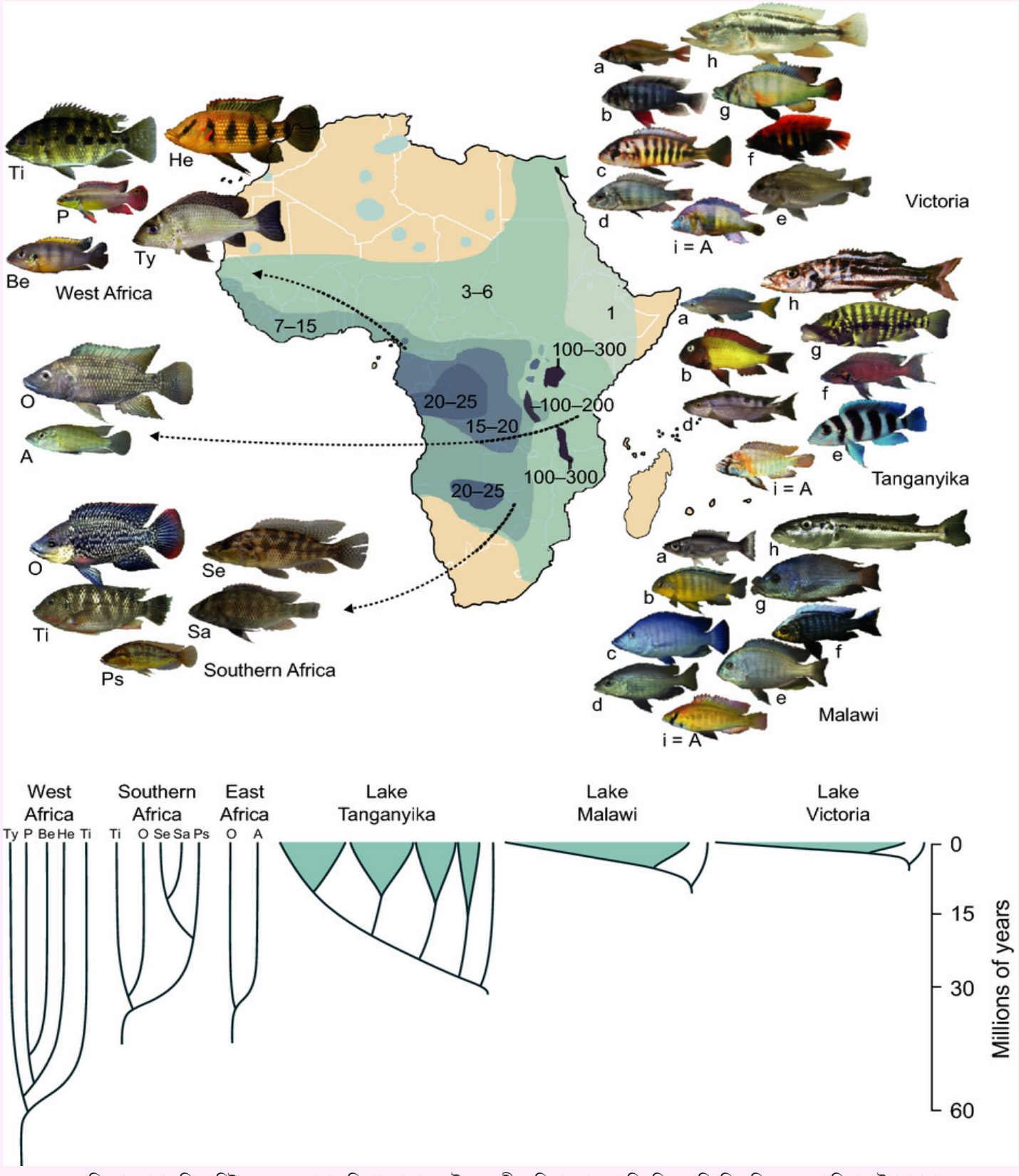

প্রতি দশ স্কোয়ার কিলোমিটারে কতগুলো প্রজাতি পাওয়া যায় সেই অনুয়ায়ী আফ্রিকা মহাদেশে সিকলিডের স্পিসিজ রিচনেসের গ্রাফিকাল উপস্থাপনা।

স্পেশালাইজেশনের পারদর্শিতা যে কোন সময়ে স্বখাত সলিলে ডুবে মরার ফাঁদ হয়ে উঠতেই পারে। অন্তত খাবারের ক্ষেত্রে সিকলিডদের এই ঝুঁকি নেওয়ার কারণটার একটা সহজ ব্যখ্যা আছে। আর পাঁচটা মিষ্টি জলের মাছেদের চোয়াল বলতে যে ব্যপারখানা বুঝি সিকলিড পরিবারের সদস্যদের সেই চোয়াল জোড়া ছাড়াও আরো এক জোড়া অতিরিক্ত চোয়াল থাকে তার গলায়। যার পোষাকি নাম ফ্যারিঞ্জিয়াল জ (Pharyngeal jaw)। সিকলিডদের মুখের চোয়াল জোড়া খাবার ধরা থেকে সে খাবারের প্রস্তুতিকরণের প্রাথমিক দায়ভার বহন করার পর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় দ্বিতীয় চোয়াল জোড়ার ওপর। সুতরাং এই পরিবারের মাছেদের বিভিন্ন প্রজাতির হাঁ-মুখের চোয়াল জোড়া বিবর্তনের ধারায় নানান ভাবে অভিযোজিত হলেও, গলার মধ্যে লোকানো চোয়াল জোড়া কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই মোটের ওপর একই কাজ করতে পারে। সিকলিড পরিবারের মাছেরা তাই একই সাথে নির্দিষ্ট খাবারের

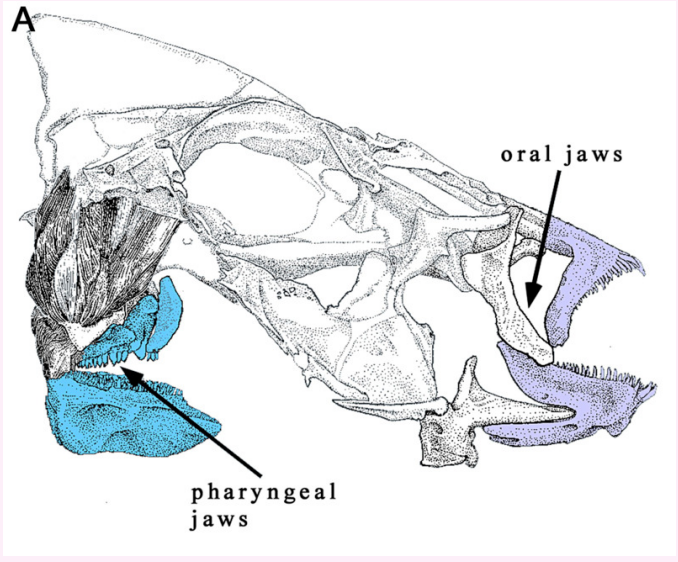

সিকলিডদের ওরাল আর ফ্যারিঞ্জিয়াল চোয়ালের অবস্থান।

জন্য স্পেশালাইজড হলেও, তাদের গলার গোপন কন্দর সর্বদা পাঁচমেশালি খাবারের জন্য প্রস্তুত। বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান এর আদর্শ উদাহরণ আর কি! আর ঠিক তাই যদি কখনো কোনো নির্দিষ্ট খাবারে অভিযোজিত সিকলিডের সংকীর্ণ খাদ্যতালিকায় টান পড়ে, এরা বাকি মাছেদের থেকে দ্রুত বিকল্প খাবারদাবারের কথা চিন্তাভাবনা করতে পারে।

তাহলে সিকলিডদের গলার চোয়াল জোড়াকে অনায়াসেই খাবারের ব্যপারে স্পেশালাইজড হওয়ার ঝুঁকির একটা উত্তর বলতে পারি। কিন্তু এই যে সব তাকলাগানো উদ্ভাবনী অভিযোজন তার উৎস কি? বা অন্যভাবে বললে সিকলিডদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মূলে যে জিনগুলো, সেগুলো এত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে কীসের প্রভাবে? কিভাবেই বা দুর সম্পর্কের সিকলিডদের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? এই ধাঁধার সমাধানে উঠে পড়ে লেগেছেন একদল গবেষক। ২০১৪ সালে তারা বেশ কিছু নিকটাত্মীয় আফ্রিকান সিকলিডের জিনোম সিকোয়েন্স ডিকোড করেন এবং তাদের জিনোম সিকোয়েন্সের মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বিচার করতে থাকেন। একই সঙ্গে ওই সিকলিডদের জিনোম সিকোয়েন্সের সাথে তুলনা টানেন সিকলিডদের কাছাকাছি কিন্তু অনেক কম অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন স্টিকলব্যাক মাছদের পরিবারের। গোড়াতেই তারা খোঁজ করেন সেইসব মিউটেশনের যারা প্রোটিনের গঠনগত একক, অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিবর্তন ঘটায়। আসলে একটা কোষের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অনেকটাই সামলায় নানান প্রোটিন, আর সেই প্রতিটি প্রোটিন তৈরি হয় নির্দিষ্ট জিন থেকে তৈরি অ্যামাইনো অ্যাসিডের নানান বিন্যাসে। তাই এই বিশেষ দিকটিতে তারা প্রথমেই নজর দেন। গবেষকদের মতে, পরিবর্তিত অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত প্রোটিনের অধিক প্রাচুর্য এই ইঙ্গিত বহন করে যে পরিবর্তিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের তথ্য যে নির্দিষ্ট জিনের কোডে লোকানো থাকে সেই জিনটির কোনো কারণে দ্রুত বিবর্তিত হাওয়ার তাগিদ আছে। আর এই পদ্ধতিতে পরিবর্তিত প্রোটিন যদি কোনোভাবে কোনো মাছের বেঁচে থাকায় বা প্রজননে সহায়ক হয়, তাহলে পরের প্রাকৃতিক নির্বাচনের গল্পটা আমাদের খুব চেনা। মজার কথা হল গবেষকদের জিনোম সিকোয়েন্স করা সিকলিডদের একটি আমাদের অতি পরিচিত তেলাপিয়া, যে নিশ্চিত ভাবে অভিযোজনের ধারায় তার পরিবারের বাকি আফ্রিকান সদস্যদের মতো কুলীন নয়। কিন্তু তা স্বত্বেও গবেষকরা দেখলেন তেলাপিয়ার জিনে মিউটেশনের হার স্টিকলব্যাকদের তুলনায় অনেকটাই বেশি। আর লেক ভিক্টোরিয়া বা মালাউইর বিস্তৃত সিকলিড প্রজাতির মিউটেশনের হার যে তেলাপিয়ার থেকেও কয়েকগুণ বেশি হবে এতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু এই পরিবর্তিত প্রোটিনের ভূমিকা কি? যদি বলি এরকমই মিউটেশনের খোঁচা খাওয়া কিছু জিন (এবং তা থেকে সংশ্লেষিত পরিবর্তিত প্রোটিন) সিকলিডদের চোয়ালের নানান অভিযোজনে দায়ী তবে মনে হয় ধোঁয়াশাটা কিছুটা হালকা হয়।

সিকলিড বিবর্তনে কোনো স্বতন্ত্র জিনের ভূমিকাও নেহাত কম নয়। কোষ বিভাজনের সময় ডিএনএ-র রেপ্লিকেশন বা ছাঁচে ফেলে নকল করার পদ্ধতিতে কোনো গলদের ফলে কোনো জিন সিকোয়েন্সের পুনরাবৃত্তি বা ডুপ্লিকেশনও কিন্তু বিবর্তন তথা নতুন প্রজন্মের উদ্ভবে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

ধরা যাক কোনো একটি জিন সিকোয়েন্সের পুনরাবৃত্তি হল, এমতাবস্থায় ওই পুনরাবৃত্ত সিকোয়েন্সটি বেশ খানিকটা নিশ্চিন্তে মিউটেটেড বা পরিবর্তিত হতে পারে, কারণ পুনরাবৃত্ত খন্ডের পরিবর্তন হলেও আসল খণ্ডটি নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে চলে। আর দেখা এই পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই নতুন। নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটায় যা পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সহায়ক হতে পারে। আর ওই সাধারণ স্টিকলব্যাক মাছেদের থেকে আফ্রিকান সিকলিডদের এই জিন ডুপ্লিকেশনের প্রবণতা পাঁচ গুণ বেশি। বেশ চমক লাগানো ব্যপার বটে!

এখানেই শেষ নয়। এর পরেও আছে ট্রান্সপোসেল এলিমেন্ট বা জাম্পিং জিনের গল্প, আছে কনসার্ভড ননকোডিং এলিমেন্ট (CNE) আর মাইক্রো RNA-র নানান ব্যখ্যা। কিন্তু তাতেও যে এই রহস্যের সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে সেটা হয়তো জোর দিয়ে বলা যাবেনা। কিন্তু ক'টা নদীর সিকলিড পূর্ব আফ্রিকার লেকে ঢুকে নতুন নতুন ইকোলজিকাল নিস এবং প্রাকৃতিক বাধার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে বিবর্তনের এক পলকে যে বিচিত্রতার সৃষ্টি করেছে তার জুড়ি মেলা ভার। আর বলাই বাহুল্য তার সাথে জড়িয়ে আছে আফ্রিকান সিকলিডদের অগাধ সৌন্দর্য। সেটা বাহ্যিক রূপেই হোক কি আচরণে। যার টানে আমরা শখের মেছোরা বহুবছর ধরে মজে আছি, আর নিশ্চিতভাবে আরো বহু বছর ধরে থাকবো। আফ্রিকান সিকলিড নিয়ে এই বিশ্বব্যাপী ভালোবাসাটা যদি না থাকতো তবে শুধু বিজ্ঞানের খাতিরে এদের এই জনপ্রিয়তা থাকতো কিনা বলা মুশকিল।

চিত্র সূত্র - ইন্টারনেট।

For Creation and Maintenance of Natural Pond, Artificial Pond,
Lily Pool, Koi Pond and other Aquascapping, Landscaping,
creation of Urban Forest, Orchard, Kitchen Garden, Roof Garden

Contact

BioMates

6/7 Bijoygarh, Kolkata 700032. Dial: 9874357414/9477275731

BioMates
for a beautiful world

।। হ্রদের নীচে দৈত্য-দানব ।।

অভীক ঘোষ

মালাউই হ্রদের নীচে দৈত্য দানব থাকে। 'বিশালাকার সেসব দৈত্য চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসে, ইয়া বড় হাঁ করে ঘপাত করে বাচ্চা মাছদের খেয়ে ফেলে' জানি না এভাবে কোন মবুনা মা তার বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য দৈত্য দানবের গল্প বলে কি না, ঠিক যেমন আমাদের ছোটবেলায় ছেলে ধরার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো হতো। আসলে মালাউই জুড়ে থাকে এমন কিছু বড়সড় মাছ যারা ওই পাথুরে মবুনাদের কাছে তুলনায় দৈত্য দানব। এরা মালাউই হ্রদের মধ্যে পড়ে থাকা অজস্র পাথরের খাঁজে লুকায় না, বরং শিকারের খোঁজ সাঁতার কেটে বেড়ায় হ্রদের বিভিন্ন প্রান্তে। একদিকে যেমন এরা ছোটখাটো মাছ এবং মাছের বাচ্চাদের ধরে খায় তেমনি শিকার ধরার জন্য অদ্ভুত সব আচার আচরণে করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এরকমই কিছু অদ্ভুত শিকারী মাছেদের সম্পর্কে যাদের অ্যাকোয়ারিয়াম হবিতে পরিচিতি 'প্রিডেটর হ্যাপ' নামে।

(১) মালাউই স্যান্ড ডাইভার *Fossorochromis rostratus*

মোটামুটি ১০ ইঞ্চির কাছাকাছি বড় এই মাছটির পুরুষ সদস্যরা বিখ্যাত তাদের চোখ ধাঁধানো রঙের জন্য। উজ্জ্বল কালোর উপর ময়ূরপঙ্খী রঙ ছাড়াও যে এই মাছটার বিশেষত্ব হল মাছটির অদ্ভুত ব্যবহার। মাছটি হ্রদের কিনারার দিকে অল্প জলে দল বেঁধে থাকে। যেসব এলাকায় বালি ভর্তি সেখানে শিকারের সন্ধানে ঘোরাফেরা করে। কোন বিশেষ কারণে আক্রান্ত হলে কিংবা ভয় পেলে একদম ডাইভ দিয়ে বালির নিচে ঢুকে পড়ে। অনেকটা গ্যালেট পাখি বা পায়েড কিংফিশারের শিকার করার টেকনিকের মতো করে। এবং দীর্ঘ সময় বালির নিচে লুকিয়ে থেকে বিপদ কেটেছে বুঝলে তবেই টুক করে বেরিয়ে পড়ে। সেই থেকেই এদের নাম হয়েছে Malawi Sand diver। মালাউই হ্রদের বেশিরভাগ সিকলিডের মতোই রস্ট্রাটাসরাও Sexually dimorphic, অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের রং আলাদা, ছোটবেলা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত পুরুষ মাছটি ধীরে ধীরে রং বদলায়, স্ত্রী মাছটি একই রকম থেকে যায়। অ্যাকোয়ারিয়ামে এই জিনিস দেখা নিঃসন্দেহে খুব আকর্ষণীয় ব্যপার।

(২) লিভিংস্টোনি সিকলিড (*Nimbochromis livingstonii*) :

ইংরাজিতে একটা কথা আছে Love me or hate me but you can not ignore me, লিভিংস্টোনিদের সাথে বেশিরভাগ যাঁরা কম-বেশি মালাউই হ্যাপ পছন্দ করে তাদের সম্পর্ক এরকম। কারণ এই মাছ যে কোন আফ্রিকান ট্যাঙ্কের জন্য ১০ ইঞ্চির মূর্তিমান বিভীষিকা। চরম আগ্রাসী, মারাত্মক মারামারিবাজ পালোয়ান হ্যাপ, যে মাছ অ্যাকোয়ারিয়ামের সব মাছকে ইচ্ছা মতো শাসাবে, এবং ছোট মাছ পেলে ধরে ধরে খাবে। তবে এতো কিছুর পরও ওকে আপনার ভালো লাগবে। কারণ, ও ইচ্ছা মতো রঙ বদলাবে, এই এখন জংলা ছাপ ওয়ালা তো কিছুক্ষণ পরেই সবজে নীল হয়ে যাবে। কখনো দেখবেন পাথরের উপর শুয়ে মরার মতো পড়ে আছে কখনো আবার দেখবেন বালির উপর চুপচাপ বসে। ঠিক যখন ভাববেন মাছটা অসুস্থ হয়তো বা মরেই গেছে, ঠিক তখনই কোন ছোট মাছ সামনে গেলে তীব্র গতিতে বিশালাকার মুখ খুলে উদরস্থ করে নেবে। এবং মজার ব্যাপার হলো যে অ্যাঙ্গেলে মাছটি শুয়ে থাকবে ঠিক সেই অ্যাঙ্গেলেই স্পিড অ্যাক্সিলারেট করে ল্যাটেরাল মুভমেন্ট করবে। তাই এই রকম যার অদ্ভুত অদ্ভুত সব বিহেভিয়ার, তাকে কি আপনি ভালো না বেসে পারবেন?

মৃত মাছের ভান করে লিভিংস্টোনি

তবে এই রকম বিহেভিয়ারের পিছনে আছে আরও মজার একটা গল্প। স্বদেশে কালিঙ্গোনো নামে পরিচিত এই মাছটি পাওয়া যায় মূলত তিনটি জায়গায়, লেক মালাউই, লেক মালোম্বে এবং সিরে নদীতে। যেখানে জলজ ঘাসের গোড়ায়, ভ্যালিসনেরিয়ার জঙ্গলে বা পাথরের খাঁজের মধ্যে এরা শিকারের আশায় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। এবং নিজের মুখের চেয়ে চেয়ে আকারে ছোট যে কোন মাছকেই নির্দ্বিধায় আক্রমণ করে।

যেহেতু এরা লুকিয়ে থেকে শিকারে পটু তাই এদের গায়ের জংলা রং এদের camouflage হতে সাহায্য করে। তবে শিকার ধরার ড্রেস দেখে যেহেতু কোনো মহিলা আকৃষ্ট হতে চাইবে না এবং শিকারকালীন পোশাক আর কোন মহিলার সাথে ডেটে যাওয়ার পোশাক আলাদা আলাদা। কোনো মহিলাকে ইমপ্রেস করতে হলে এরা নিজেদের গায়ের রং দ্রুত বদলে সবজে নীল করে নেয়। তবে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশে অন্যান্য মালাউই হ্যাপের

মতো এরা কিন্তু কলোনিতে থাকে না। পুরুষ লিভিংস্টোনিরা ভবঘুরে শিকারী। মহিলারা মাউথ ব্রুডার। এবং এরাই সেই সব হাতেগোনা হ্যাপেদের মধ্যে একটা যাঁরা এখনও বহু জেনারেশনের captive breeding এর পরেও ফ্রাই রিলিজ ও রি-হোল্ডিং বিহেভিয়ারটা ট্যাঙ্কের মধ্যেও করে থাকে। ছোট বাচ্চাদের মা দেড় থেকে দুই সপ্তাহ নিজের মুখে রেখে বাচ্চাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে, তারপর বাচ্চারা একটু বড় হলে রেখে আসে ভ্যালিসনেরিয়ার জঙ্গলে। সেখানে পাথরের খাঁজে বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে এরা শুরু করে স্বাবলম্বী শিকারী জীবন।

(৩) মালাউই আই বাইটার (*Dimidiochromis compressiceps*) :
ছুরির ফালার মতো তীক্ষ্ণ আকৃতির একটা মাছ মালাউই হ্রদের কিনারার দিকে যেখানে পাথর তুলনায় কম বরং গাছপালা একটু বেশি সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। ফুট খানেক লম্বা এই মাছটার গায়ের রংটা উজ্জ্বল ধাতব নীল, চোয়ালটা শক্ত, এবং একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ছোট ছোট একদল সিকলিডের বাচ্চাদের দিকে যাঁরা বুঝতেও পারছে না তাদের সামনে কি বিপদ লুকিয়ে আছে। চ্যাপ্টা দেহের ক্ষীপ্র গতির এই মাছটার নামই মালাউই আই বাইটার। আসলে কিংবদন্তি আছে মাছটা নাকি তার শিকারের চোখ খুবলে খায়। সেকথা কতটা সত্যি তা জানা নেই তবে এ মাছ যে মুখে যা ধরে তাই গিলে খায় এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। থাকবেই বা কেন ইনি যে মালাউই হ্রদের অন্যতম দুর্ধর্ষ শিকারী, যিনি লুকিয়ে থেকে শিকার ধরতে পছন্দ করেন। ভ্যালিসনেরিয়ার জঙ্গলে হোক বা পাথরের খাঁজে, শিকারী বাজের মতো মাথা নিচু করে নিশ্চুপ হয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে পারে। তারপর সুযোগ বুঝলেই বিদ্যুৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সরু দেহটা তখন অনায়াসে ঝোপ জঙ্গল বা পাথরের খাঁজে ঢুকে শিকারকে টেনে বের করে। অ্যাকোয়ারিয়ামে শখেও আই বাইটার কিন্তু বেশ জনপ্রিয় মাছ। এদের শিকারী স্বভাব ও উজ্জ্বল রঙের ছটায় বহু মাছপুষিয়েই ঘায়েল হন, তবে মনে রাখতে হবে অ্যাকোয়ারিয়ামে এদের ভালো রাখতে হলে নিয়মিত ছোটখাটো মাছের যোগান দিতে হবে তবেই ওদের ওই আশ্চর্য আচার আচরণ চাক্ষুষ করা যাবে। আই বাইটার পুষতে হলে অবশ্যই একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন, ঠিক আই বাইটারদের মতোই দেখতে এদেরই এক জাতভাই বাজারে খুবই কমন, যাদের বলে *Dimidiochromis strigatus* বা ফলস আই বাইটার। ছোটবেলায় এই দুই প্রজাতি প্রায় একই রকম দেখতে থাকে। তবে বড় হলেই দেহের গঠনে পার্থক্য চোখে পড়ে। আসল আই বাইটার স্ট্রিগেটাসের তুলনায় অনেক বেশি ধনুকাকৃতির হয়ে থাকে, এবং আসল আই বাইটাররা সাধারণত শিকারের লেজের দিক থেকে খেতে শুরু করে।

(৪) মালাউই হক (*Aristochromis christyi*) :
উত্তর আমেরিকার গ্রেট প্লেন। মিসিসিপি নদীর পশ্চিম দিকে রকি পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ঘাসের বন। সেখানে মাটিতে গর্ত করে বসবাস করে অজস্র ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, আদুরে দেখতে সে প্রানীর নাম প্রেইরি ডগ। নামেই ডগ, আসলে ভিজে বেড়াল। সারাদিন গর্তের বাইরে এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ এদের বিপদ যে শুধু মাটিতেই নয় আকাশ থেকেও আসতে পারে। উত্তর আমেরিকার বাজপাখি, এদের দুর্ধর্ষ দুশমন। ছোঁ মেরে এসে প্রেইরি ডগ ধরে। ভাবছেন মাছের লেখালেখির মধ্যে এসব ডাঙ্গার গল্প কেন বলছি? বেশ তবে খোলসা করেই বলি, ঠিক এই জিনিসটাই আপনি দেখতে পাবেন মালাউই হ্রদের জলের নিচে। ছোটখাটো উটাকা কিংবা মবুনাদের কল্পনা করুন ওই প্রেইরি ডগের মতো করে, আর বাজপাখি স্বয়ং মালাউই হক। ক্ষীপ্র গতির শিকারী মাছ। পাথরের খাঁজে বাসা করা মবুনাগুলোকে বাজপাখির মতোই উপর থেকে এসে ধরে। প্রায় ফুটখানেক লম্বা এই মাছটা অনেক উপর থেকে শিকার কে টার্গেট করতে হবে। কোনাকুনি ভাবে একচোখে শিকারকে দেখে নিয়েই ওই অ্যাঙ্গেলেই ছোঁ মেরে ঝাপিয়ে পড়ে। বাজপাখির মতো শুধু স্বভাবই নয় আশ্চর্যজনক মিল এদের মুখেও। অনেকটা বাজপাখির মতোই এদের মুখে ছোট্ট একটা ঠোঁটের মতো দেখতে অংশ থাকে। আংটার মতো দেখতে ওই অংশটাই এদের মালাউই হ্রদের অন্যান্য মাছদের থেকে পৃথকভাবে চিনতে সাহায্য করে।

(৫) বিগ মাউথ হ্যাপ (*Tyrannochromis macrostoma*):
আচ্ছা একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করে দেখেছেন, বেশিরভাগ মাছের পিঠের দিকটা গাঢ় রঙের হয় এবং পেটের দিকটা হালকা! আসলে কেন এমন হয় বলুন তো? আজ্ঞে আপনি ঠিকই ধরেছেন, উপরের দিকে গাঢ় রং থাকলে জলের গভীরতার আলো আঁধারির সাথে সেই রং মিশে যায়, ফলে উপর থেকে শিকারীরা ওই মাছকে সহজে টার্গেট করতে পারে না। আবার পেটের দিকটা হালকা হলে মাছটি যখন সাঁতার কাটে তখন তার নিচে থাকা মাছেরাও ওই মাছটিকে সহজে বুঝতে পারে না। ফলে দুই তরফা ভাবে পরিবেশের সাথে মিশে আত্মরক্ষা করতে পারে। এবং নিজেকে লুকিয়ে রেখে সহজেই শিকার ধরতে পারে। তবে প্রকৃতি খামখেয়ালি। সবসময় নিয়ম মেনে চলে না,

হামেশাই এমন জিনিস তৈরি করে যা ঠিক ব্যাকরণ মেনে চলে না। ঠিক যেমন *Tyrannochromis macrostoma*, মালাউই হ্রদের অন্যতম টপ প্রিডেটর। গাট্টাগোট্টা টর্পেডোর মতো চেহারা, শক্তিশালী চোয়াল। এবং দেহের উপরের অংশ হালকা রঙের এবং নীচের অংশ গাঢ় কালচে। কারণ? মাছটাই যে উল্টো হয়ে সাঁতার কাটতে পারে! এদের প্রধান শিকার মবুনারা যেসব পাথরের খাঁজে বাসা বাঁধে, সেখানে গিয়ে মরা মাছের মতো মাথা নিচে পেট উপরে করে সাঁতার কাটে। অদ্ভুত এই আচরণ দেখে মবুনারাও মরা মাছ মনে করে ভুল করে, আর ভুল করে কাছে গেলেই ঘপাৎ!

আচ্ছা এইসব অদ্ভুত আচরণের দৈত্য দানবদের সম্পর্কে পড়ে যদি মনে হয় এদের কি আমাদের বাড়িতে এনে রাখা সম্ভব? তবে উত্তর কিন্তু অবশ্যই সম্ভব। তবে এবার প্রশ্ন আসে কতো বড় ট্যাঙ্ক চাই? সহজ উত্তর যতো বড় খুশি তত বড় হলে ভালো হয়, এতো বড় ট্যাঙ্ক করুন যাতে বাড়িতে লোকজন এলে অবাক হয়ে বলে 'অ্যাত্তো বড় অ্যাকোয়ারিয়াম! এটা অ্যাকোয়ারিয়াম না কাঁচের চৌবাচ্চা?'। কারণ একে তো এরা ফুট খানেক সাইজের বড় মাছ, তারপর এরা থাকে ৮-১০ টার কলোনিতে (একটি বা দুটি পুরুষ মাছ পিছু ৭-৮ টি স্ত্রী মাছ) তারপর এলাকা দখল হোক বা প্রজননের অধিকার, কোন কারনে একবার মালাউই হ্যাপদের মারামারি শুরু হলে রক্তারক্তির সম্ভবনা যথেষ্টই থাকে। তাই ছোটখাটো অ্যাকোয়ারিয়ামে মালাউই হ্যাপদের রাখার চিন্তা ভাবনা না করাই ভালো। আসলে মালাউইর এসব দৈত্যরা ছোটখাটো অ্যাকোয়ারিয়ামেরই মাছ না। জায়েন্ট বা মন্সটার অ্যাকোয়ারিয়ামই এদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।
প্রথমত এই ধরনের মাছগুলো আকারে তুলনায় বেশ বড় , এবং এদের শক্তিশালী চোয়াল এবং দাঁত থাকে। যার সাহায্যে অ্যাকোয়ারিয়ামের একটা বড় জায়গা ডমিন্যান্ট মেল একাই দখল করে রাখে। বাদবাকি মাছেদের এক কোণায় ঠেলে দেয় এবং ক্রমাগতভাবে মারতে থাকে। এতে কোণঠাসা মাছগুলো সারাক্ষণ স্ট্রেসে থাকে, রং দেখানো তো দূরের কথা, খাবার-দাবার ঠিকমতো খেতে পায় না, গ্রোথ হয় না, নানান রোগে আক্রান্ত হয়ে র্যাঙ্ক-অর্ডারে শেষের দিকে থাকা মাছগুলো একটা একটা করে মরতে থাকে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই মনে করেন মাছের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেই হয়তো অ্যাগ্রেসনের সমস্যা কমে যাবে। এর পেছনে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়িয়ে দিলে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাগ্রেসন কমে যায় বলে যে ধারণা আছে তা কিন্তু মোটেও কোনো সঠিক ধারণা নয়। কারণ আপনি সংখ্যা যতোই বাড়িয়ে দিন না কেন ট্যাঙ্ক ছোট হলে ডমিনেন্ট মেল টপ টু বটম সব্বাইকে ধরে ধরে মারবে। ডমিনেন্টকে সরালে আবার যে ডমিনেন্ট হবে সেও একই ভাবে মারবে। এইভাবে চলতেই থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি জনসংখ্যার অনুপাতে বড় ট্যাঙ্ক দিচ্ছেন যেখানে প্রতিটি মাছ নিজেদের নিজেদের টেরিটোরি নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে বা কেউ আক্রমণ করলে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।
তাছাড়া এসব মাছেরা অন্যান্য মাছেদের খায়, ছোটখাটো থেকে মাঝারি সাইজের মাছও আরামসে উদরস্থ করে, একটা ইঞ্চি দশকের প্রিডেটর হ্যাপের কাছে তাই ৪-৫ ইঞ্চির মবুনা বা পিককও সেই অর্থে নিরাপদ থাকে না। অতএব সব মিলিয়ে এদের সম আকার আকৃতির প্রিডেটর হ্যাপদের সাথে রাখাই ভালো। অতএব শেষ কথা আট দশ ফুটের অ্যাকোয়ারিয়াম না হলে এদের রাখার কথা চিন্তা না করাই ভালো।

ট্যাঙ্ক তো করলেন এবার ফিল্ট্রেশন কি হবে? কারন Filtration is the key factor of any successful Malawi Haplochromis tank– এই একটা ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করবে আপনার ট্যাঙ্ক দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না। যেহেতু বিশাল সাইজের ট্যাঙ্ক, বিপুল পরিমাণ জল, সাথে সম অনুপাতে মাছ ও তাদের খাদ্য এবং এইসব মাছ খায় বেশি, ছড়ায় বেশি এবং নোংরাও করে বেশি ; অথচ থাকতে পছন্দ করে একেবারে স্বচ্ছ জলে, তাই সামান্য অ্যামোনিয়া-নাইট্রেটও এরা সহ্য করতে পারে না। অতএব With great tank comes great filtration system, তাই সাম্প বেস্ট অপশন। ব্যাক্তিগতভাবে অনেককেই ওভারহেড সাম্প ব্যবহার করতে দেখেছি। সাবমার্সিবল পাম্পের সাথে সাথে ট্যাঙ্কে ওয়েভ মেকার লাগিয়ে ডেড স্পট কভার করতে দেখেছি, সেটাও খুব একটা মন্দ অপশন নয় বটে তবে শুধু স্পঞ্জ বা টপ ফিল্টারের ভরসায় মালাউই হ্যাপ করতে না যাওয়াই ভালো। বড় ট্যাঙ্কের দুদিক দিয়ে দুটো টপ কিংবা একটা বড় জ্জঞ্চচদিয়ে কাজ চালানোর কথা ভুলেও ভাববেন না, ওসব অ্যাডিশনাল ফিল্ট্রেশন হিসেবে দেওয়া যেতেই পারে কিন্তু মেইন ফিল্ট্রেশন সাম্প বা একাধিক ক্যানিস্তারের মতো দক্ষ ফিল্টার সাহায্য ছাড়া অন্য কোন ফিল্টারের হাতে ছাড়া উচিত হবে না। মনে রাখবেন অ্যামোনিয়া নাইট্রেট বিহীন স্বচ্ছ পরিস্কার জল ছাড়া কখনোই এইসব প্রিডেটর মাছেদের কাঙ্ক্ষিত রং পাবেন না। তাই মেক্যানিক্যাল ফিল্ট্রেশনের পাশাপাশি বায়োলজিক্যাল ফিল্ট্রেশনেও গুরুত্ব দেওয়া খুব জরুরি। দরকারে টেস্ট কিট ব্যবহার করে নিয়মিত জলের প্যারামিটার চেক করুন, সপ্তাহ একদিন ২৫-৩০ জল বদলে ফেলে নতুন জল দিন।
এবার আসি খাবার-দাবারের প্রসঙ্গে, সব মালাউই সিকলিডদের একটা কমন বৈশিষ্ট্য হল এরা খাবার নিয়ে খুব একটা ঝামেলা করে না, খাবার দিলেই সোনামুখ করে খায়। আপনি ট্যাঙ্কের কাছে গেলেই খাবার চেয়ে তুমুল লাফালাফি শুরু করে দেয়। তবে আদর করে একদম বেশি খাওয়াবেন না কিন্তু , লাইভ ফ্রোজেন, ফ্লেক যাই দিন না কেন দিনে দুবারের বেশি দেবেন না, এবং এমন পরিমানে দেবেন যাতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাবার শেষ করতে পারে। এর সাথে সাথে আবার পেট যেন ভরে যায় সেদিকটাও খেয়াল রাখতে হবে। যেহেতু সারাদিন এরা ছোটাছুটি করে এবং ডমিনেন্ট মাছেরা খাবার সময়তেও সাবডমিনেন্টদের তাড়া করে বেড়ায় তাই অ্যাকোয়ারিয়ামের প্রতিটি মাছ সমানভাবে খেতে পাচ্ছে কি না সেটাও খেয়াল রাখা জরুরি। সবচেয়ে ভালো হয় খাবার দেওয়ার পাঁচ মিনিট আগে থেকে খাবার শেষ করার পাঁচ মিনিট পর পর্যন্ত অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে বসুন, এতে ওদের সোস্যাল বিহেভিয়ার যেমন বুঝতে পারবেন তেমনি কোন মাছ অসুস্থ কিনা, কেউ মার খাচ্ছে কি না, সঠিকভাবে সবাই খেতে পাচ্ছে কি না এগুলোও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এতে শুধু পুষ্টির দিকটি নয় সামগ্রিক ভাবে আপনার অ্যাকোয়ারিয়াম ভালো থাকবে। হ্যাপেরা মাংশাসী তাই এদের ছোটখাটো মাছ, বাজারে যে সব ব্রান্ডেড কার্নিভোর ফুড পাওয়া যায় সেগুলো দিতে পারেন। অতএব সাহস করে এগিয়ে আসুন আর করে ফেলুন চোখ ধাঁধানো মালাউই হ্যাপের হ্যাপি থাকার বাসস্থান। তবেই হবে আমার এই লেখাটি সার্থক। ধন্যবাদ।

সব ছবি: ইন্টারনেট

।।পাথুরে মাছের পাঁচালী।।

সঞ্জীব পাত্র

টোঙ্গা বা বাটোঙ্গা হলো এমন একটি উপজাতি যাদের প্রধান বসতি হলো আফ্রিকার মালাউই হ্রদের উত্তর দিকের উপকূলে। আর আফ্রিকা অন্যতম বিখ্যাত ও বৃহত্তম হ্রদের পাশাপাশি থাকতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মাছ ধরা হয়ে ওঠে তাদের প্রধান জীবিকা। আর এই মাছ ধরার সূত্রেই তারা পরিচিত হয় মালাউই হ্রদের মধ্যে থাকা এমন এক প্রজাতির মাছের সাথে যারা ওই হ্রদের পাথরের খাঁজেখোঁজে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। তাদের তুলনায় ছোট আকৃতিও তাদের এই পাথরের খাঁজে লুকোচুরি খেলার বেশ সহায়ক। তাই এই প্রজাতির মাছকে তারা নাম দেয় 'মবুনা' বা 'পাথুরে মাছ'। আর আজ এই নামের কদর সারা পৃথিবীর রঙিন মাছ পুষিয়েদের কাছে যে কতোটা সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গায়ের উজ্জ্বল রঙ আর পাথরের একাধিক ফাঁকে লুকিয়ে থাকা, উঁকি মারার বিহেভিয়ার, এই দুই এর জন্য কাঁচবাক্সের অন্যতম জনপ্রিয় মাছ হয়ে উঠতে এদের বেশী সময় লাগেনি। সাথে রয়েছে এদের পাথরের গা থেকে শ্যাওলা খুঁটে খাওয়ার নিরামিষ অভ্যাস যা প্রধানত এদের শিকারী মাংশাসী হ্যাপলোক্রোমিস গ্রুপের থেকে আলাদা করে দেয়। তাহলে চলুন, জেনে নিই মালাউই হ্রদের কিছু জনপ্রিয় মবুনার সুলুক-সন্ধান।

(১) ইয়োলো ল্যাব/ ব্যানানা সিকলিড (*Labidochromis caeruleus*) :
অ্যাকোয়ারিয়ামের দোকানের বিখ্যাত হলুদ মাছ ; হাটে, পথে-ঘাটে যেখানেই রঙিন মাছ বিক্রি হতে দেখবেন সেখানেই দু-চারপিস এদের পাবেন। আদরের ব্যানানা, বাঙালির 'কলা মাছ'। যাঁরা একেবারে আনকোরা নতুন শুরু করেছেন তাঁরা থেকে বাঘা মালাউই কিপার হলুদ রঙের সিকলিড বললেই এদের কথা সবার আগে সবার আগে মনে আসতে বাধ্য। তবে জানেন কি এই কলাবাগানের সব কলা কিন্তু হলুদ নয়, হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন সব ল্যাবিডোক্রোমিস হলুদ হয় না মশাই, কেউ কেউ সাদা, কেউ কেউ নীলচে পর্যন্ত হয়। তবে যে রঙের হোক না কেন স্বভাবে সবাই মোটামুটি শান্ত সামাজিক সিকলিড যাঁরা আফ্রিকার মালাউই হ্রদের আদিবাসিন্দা। ওই হ্রদের পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে যে পাথুরে এলাকা আছে সেখানেই এদের ঘর সংসার। ওখানেই অগভীর জলে পাথরের মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে জীবন যাপন করতে ভালোবাসে। পাথরের উপর যে শ্যাওলা হয় সেগুলো দিয়েই লাঞ্চ-ডিনার সারে। তবে সাথে ছোটখাটো পোকামাকড়ের লার্ভা, শামুকের বাচ্চা ইত্যাদিও অল্প-স্বল্প উদরস্থ করে। সেদিক দিয়ে দেখলে প্রাকৃতিক ভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা শাকাহারী হলেও, কখনো কখনো সামান্য প্রানীজ প্রোটিনের উপর নির্ভর করে। অ্যাকোয়ারিয়ামেও তাই খাবার দেওয়ার সময় ভেজিটেবল ফুডের উপর গুরুত্ব দেওয়াই ভালো।

যেহেতু পাথর খুঁটেই এদের দিন চলে, তাই পাথরের দখল নিয়ে এদের যতো মারামারি। সাধারণত একটি পুরুষ মাছ কোন একটি পাথরের খাঁজে নিজের বাসা বানায়, এবং সংশ্লিষ্ট পাথরটিকে নিজের সম্পত্তি মনে করে, সেখানে দ্বিতীয় কোন পুরুষ কু-নজর দিয়েছে বুঝলেই 'কেলিয়ে বৃন্দাবন' দেখিয়ে দিতে পছন্দ করে। ওই পাথরের উপরেই ওরা নাচানাচি করে মেয়েদের ইমপ্রেস করে ওখানেই ছানাপোনা উৎপাদনের জন্য যা যা করার দরকার তাই তাই করে এবং ডিম পাড়লেই মায়ের মুখের ভরসায় সব দায়-দায়িত্ব দিয়ে পুরুষ কেটে পড়ে। মায়েরা প্রায় মাস খানেক না খেয়ে-দেয়ে সেই বাচ্চাদের মানুষ করে অ্যাকোয়ারিয়ামে এদের রাখতে হলে সবচেয়ে ভালো হবে ঝাঁকে রাখলে, ১০-১২ টার ঝাঁকে ২-৩ টে মেল, বাকিগুলো ফিমেল। একটা ২০০ লিটারের অ্যাকোয়ারিয়াম। প্রচুর পাথর, পাথরের গায়ে শ্যাওলা, ফাঁক ফোঁকরে হলুদের হুটোপুটি খেলা জমে যাবে বস।

(২) ডেমাসনি সিকলিড (*Pseudotropheus demasoni*) :
১৯৯৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস। লেক মালাউই-র তাঞ্জানিয়ান উপকূলে পাথরবাসী সিকলিডদের ওপর আয়োজিত হচ্ছিল এক সার্ভে যার অন্যতম সদস্য ছিলেন এড কোনিংস। সার্ভেকারীদের ট্রলার রুহুহু নদীর ডেল্টা ছাড়িয়ে প্রায় ১৫ কি.মি মতো দক্ষিণে এসছে পোম্বো রকের কাছে। পোম্বো রক হলো একটা অগভীর রীফ অঞ্চল যেটা বিভিন্ন এন্ডেমিক সিকলিডদের স্বর্গরাজ্য বলা চলে। স্বাভাবিক ভাবেই পোম্বো রকের কাছে আসতেই সার্ভেয়ারদের নজর হয়ে উঠল বেশী সতর্ক। বিভিন্ন প্রজাতির সিকলিডের সাথে তারা প্রথমবার লক্ষ্য করলেন এক উজ্জ্বল নীল রঙের সিকলিডকে যার গায়ে কালো ডোরাকাটা দাগ! তবে তারা সংখ্যায় যে বিশাল পরিমাণে আছে তা নয়। তাই এড কোনিংস তাঁর এই সার্ভের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সময় এই মাছটির সম্পর্কে লিখেছিলেন It is however not abundant and therefore collection of this very desirable (aquaristically speaking) cichlid should be restricted to those specimens deemed necessary for its propagation in captivity। এখনও কিন্তু এই মাছ ICUN এর লিস্টে Vulnarable ক্যাটেগোরির অন্তর্গত। আজ আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এই উজ্জ্বল নীলবর্ণ মবুনাটি যার নাম এড কোনিংস তাঁর ওই সার্ভের পিছনে উৎসাহ দেওয়া মানুষটি, মিস্টার লইফ ডেমাসন এর নামে রেখেছিলেন ডেমাসনি সিকলিড।
বর্তমানে মবুনাকিপারদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় এই মাছটি লম্বায় প্রায় ৩ ইঞ্চি

মতো বাড়তে পারে। এদের দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গায়ে মখমলের মতো ঘন নীল রঙ এবং তার মধ্যে কালো এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর হালকা নীল এবং সাদার দাগ থাকে। পুরুষ ডেমাসনির এনাল ফিনে একটা স্পট থাকে যেটা ফিমেলদের থাকে না। আর ফিমেল ডেমাসনি তুলনায় কম উজ্জ্বল এবং আয়তনে কম বড়ো হয়। অ্যাকোয়ারিয়ামে বাকি মবুনাদের থেকে এদের চাহিদা খুব আলাদা কিছু নয়। জলের উষ্ণতা মোটামুটি ২৩-২৭ সেলসিয়াস আর পি.এইচের মান একটু ওপরের দিকে,ওই ৭-৮ মতো হলেই এরা খুশি। সাথে চাই লুকোনোর মতো অফুরন্ত পাথরের ফাঁক। তাই এদের ট্যাঙ্ক সেটাপের সময় যেটা মাথায় রাখা জরুরী সেটা হলো অনেক পাথর বিভিন্নভাবে সাজিয়ে এদের যথেচ্ছ হাইডিং স্পেস দেওয়া। আর সাবস্ট্রেট হিসাবে একটু মিহি বালি,কারণ এরা বালি খুঁড়তে সিদ্ধহস্ত। পছন্দমতো পরিবেশ পেলে এরা নিজেরাই ক্রমাগত বিভিন্ন রকম বালির স্ট্রাকচার তৈরী করবে যেটা এদের ট্যাঙ্ককে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। আর হ্যাঁ,ভালো ফিল্ট্রেশন কিন্তু খুব জরুরী কারণ নাহলে ওই অতো পাথরের খাঁজে,তলায় ময়লা জমে জলের প্যারামিটার বিগড়ে দিতে পারে। এদের রাখার জন্য একটু বড়ো ট্যাঙ্ক রাখা প্রয়োজন কারণ বাকি মবুনাদের মতোই এরা ফ্রি সুইমার এবং দলে থাকা পছন্দ করে। তাই মোটামুটি ৭-৮ টার একটা ডেমাসনি কলোনি রাখতে গেলে কমপক্ষে তিন ফুট থেকে চারফুটের ট্যাঙ্ক দরকার। ডেমাসনিরা প্রধানত নিরামিশাষী এবং খাবার-দাবার নিয়ে নাক-উঁচু নয় খুব একটা। তাই এদের খাওয়াদাওয়া নিয়ে বেশী ঝামেলা এবং চিন্তা কোনোটাই তেমন নেই। অতি সহজেই এরা প্যালেট খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ম্যাচিওর ট্যাঙ্কে পাথরের গায়ে জমা শ্যাওলাও এরা খায়। তবে মাঝেমধ্যে প্রোটিন জাতীয় খাবার দেওয়াই যায়।

ব্রিডার হিসাবে এরা মাউথব্রিডারের পর্যায়ে পরে যারা মুখের মধ্যেই তাদের ফার্টিলাইসড ডিমকে ধরে রাখে,বাচ্ছা ফোটায় এবং নিরাপদ মনে করলে তাদের মুখ থেকে বের করে। তবে এরা বাচ্ছা গলাধঃকরণ করতেও সিদ্ধহস্ত। ব্রিডিং করার সময় মেল ডেমাসনি যথেষ্ট এগ্রেসিভ হয়ে পড়ে ফলে এদের ব্রিডিং বিহেভিহার নিরাপদে অবসার্ভ করার জন্য কিন্তু বেশ বড়ো ট্যাঙ্কের প্রয়োজন যেখানে কমপক্ষে এক ডজনের একটা কলোনিকে রাখা যাবে ১: ৪-৫ মেল ফিমেল অনুপাতে।

(৩) যোহানি সিকলিড।(*Pseudotropheus johannii*) :

মালাউই হ্রদের আরেকটা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং উজ্জ্বল মাছ হলো যোহানি সিকলিড। এরা মালাউই হ্রদের এন্ডেমিক মাছ, অর্থাৎ এদের কেবল এই হ্রদেই প্রাকৃতিক ভাবে পাওয়া যায়। ছোট অবস্থায় এদের গায়ের রঙ একটু হলদেটে হলেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে এদের গায়ে উজ্জ্বল নীল আর আকাশী নীল রঙের চওড়া পাশাপাশি দাগ ফুটে ওঠে যা এদের থেকে চোখ ফেরাতে দেয় না। অন্যান্য মালাউই সিকলিডের মতো এদেরও কমপক্ষে ৮-১০ টার ঝাঁকে মোটামুটিভাবে ১: ৩-৪ মেল ফিমেল অনুপাতে রাখা ভালো। সাইজে মোটামুটি ৩-৪ ইঞ্চি হলেও এরা বদমাইশি আর মারামারিতে অনেককেই পিছনে ফেলে দিতে পারে। এরা প্রধানত নিরামিষভোজী,শ্যাওলা খেতে পছন্দ করে। তবে এরা প্রাণীজ প্রোটিন ও একদম খায় না তা নয়। এদের মেল-ফিমেল আলাদা করে চেনার উপায় হলো এদের ফিমেলদের গায়ে থাকা হলদেটে কমলা রঙ। ব্রিডিং এর সময়ে মেলরা পছন্দ মতো ফিমেলকে বেছে নিয়ে বালি খুঁড়ে ব্রিডিং পিট তৈরী করে। সেখানে ফিমেল একসাথে ৫০-৬০ টা অবধি ডিম দেয় এবং ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর সময় অবধি ফিমেল রা তাদের মুখে রেখে দেয়।

(৪) গোল্ড কাউয়াঙ্গা *Metriaclima* sp. Gold Kawanga:

আফ্রিকান মবুনা মানে শুধুমাত্র রঙচঙে গড়নের জন্যই নয়, তাদের চটপটে ও আক্রমণাত্মক হাবভাব যেকোনো পাথুরে ট্যাংকে এক অনন্য মাত্রা এনেদেয়। মালাউইর নীল মাছের ভীড়ে Kawanga Gold যেন একটু অন্যরকম। নামের সাথে সাদৃশ্য রেখেই এদের বর্ণ উজ্জ্বল সোনালী হলুদ। শুধুই হলুদ অবশ্য নয়, সাথে কালো কালো ডোরা কাটা দাগ। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫-৫.৫ ইঞ্চি অব্দি পৌঁছতে পারা এই মাছটি মবুনাদের মধ্যে বেশ বড় প্রজাতি। পুরুষ মাছের রং উজ্জ্বল হলেও স্ত্রীরা তুলনামূলক অনেক অনুজ্জ্বল। স্ত্রী মাছ গুলো হালকা বাদামী বর্ণের ওপর হালকা হলুদের প্রলেপযুক্ত হয়, সেই সোনালী বর্নটা এক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। অত্যন্ত মারকুটে প্রকৃতির হিসেবে kawanga gold এর যে বদনাম রয়েছে তা কিন্তু মিথ্যে নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতার থেকে বলতে পারি মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যে dominance দেখতে গিয়ে একটি পুরুষ অপর একটি পুরুষেকে এমনভাবে আহত করে যে পরবর্তী এক মাস তাকে হাসপাতাল ট্যাংকে স্থানান্তরিত করে চিকিৎসা দিতে হয়। অর্থাৎ একাধিক পুরুষ মাছ রাখতে হলে অ্যাকোয়ারিয়াম বড় হবার পাশাপাশি এমন হতে হবে যাতে প্রয়োজনে তুলনায় দুর্বল বা ছোট মাছগুলির লুকোনোর জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে। substrate হিসেবে aragonite বা reef sand ব্যবহার করতে পারেন এতে ph buffer হয় ও নিয়ন্ত্রনে থাকে। এর ওপর প্রচুর পরিমনে পাথর ব্যবহার করে একটা কৃত্রিম মালাউই রকি স্কেপ তৈরি করা যেতে পারে। যদি অ্যাকোয়ারিয়ামে পাথরের উপর অ্যালগির আস্তরণ তৈরি হয় তবে ব্যাপারটা আরো দৃষ্টিনন্দন হবে।

মালাউই লেকের পাথুরে অঞ্চলে মোটামুটি লেকের উপরিভাগের ৬ থেকে ২২ মিটারের মধ্যে এদের বসতি। পাথুরে তলদেশের ওপর জন্মানো শেওলা খেয়েই এদের জীবনযাপন। কিন্তু তাবলে এদের পরিপূর্ণ শাকাহারি ভাবলে চলবে না, কারণ শেওলার সাথে সাথে তাতে বসবাস করা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীরাও কিন্তু এদের খাদ্য। সুতরাং অ্যাকোয়ারিয়ামে পোষার সময় সেটি খেয়াল রেখে শাকসব্জি ও প্রোটিনের এর কম্বিনেশন তৈরি করা খাবার এদের জন্য আবশ্যক। Spirulina দিয়ে তৈরি কোনো ভালো ফ্লেক জাতীয় খাবার দিনে দুই থেকে তিনবার অত্যন্ত অল্প পরিমাণে দেওয়া উচিত। তবে খেয়াল রাখতে হবে কখনোই যেন খাবার বেশি না হয়, কারণ সমস্ত মবুনা দের মতই এদেরও ব্লটের প্রবণতা বেশি। ডুবন্ত খাবার ব্যবহার খাওয়ানো এই দিক দিয়ে অনেক নিরাপদ।

বেশিরভাগ মালাউই সিকলিড এর মত kawanga gold ও mouth brooder। সাধারণত একটা পুরুষ অনেক স্ত্রী র সাথে মিলিত হতে পারে। তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় স্পনিং এর পর থেকে ১৮-২৪ দিন পর্যন্ত স্ত্রী মাছটি তার মুখের ভেতর ডিম ও পরবর্তী সময়ে বাচ্ছাদের সুরক্ষিত রাখে। এই সময়

স্ত্রী সম্পূর্ণ রূপে না খেয়ে থাকে। বাচ্চারা পরিপূর্ণ ভাবে সাঁতার শেখার পর মায়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

(৫) *Pseudotropheus* sp. 'red top' Ndumbi :

এবার এক সিঁদুরে মাছের গল্প। মালাউই হ্রদের অনন্ত জলরাশি এদের বাসভূমি হলেও বিগত কয়েক বছরের মধ্যেই খুব সহজেই এরা এদের এই অনবদ্য রূপের দৌলতে জায়গা করে নিয়েছে মেছোদের কাঁচের ঘরে। *Pseudotropheus* sp. 'red top' Ndumbi নামটি দাঁতভাঙ্গা হলেও মাছটি অত্যন্ত সহজেই পোষা যায়। সাধারণত প্রজননের সময় ছাড়া এরা বেশি আগ্রাসন দেখায় না (যদিও দ্বিমত থাকতে পারে)। মালাউই হ্রদের উত্তরভাগে তানজানিয়ার পাথুরে অঞ্চলে বিচরিত এই প্রজাতি প্রথম শোনা যায় Andreas Spreinat এর বইতে।

উত্তর মালাউই র Ndumbi অঞ্চলের বিস্তৃত জলরাশি মোটামুটিভাবে তিন রকমের ndumbi সিকলিড এর বাসস্থান হলেও , বিশেষজ্ঞ রা এদের একটা স্পিসিসের মধ্যেই এনেছেন (P*seudotropheus* sp. Ndumbi)। যেখানে Ndumbi rift এর কাছে পাওয়া স্পিসিস কে নাম দেওয়া হয়েছে *Pseudotropheus* sp. Ndumbi , ও দক্ষিণ ভাগে Pombo reef এর কাছে পাওয়া একই মাছেদের নামকরণ হয়েছে যথাক্রমে *Pseudotropheus* sp. perspicax orangcax orange-cap ও *Pseudotropheus* sp. perspicax yellow breast icax yellow breast (বিশ্বনন্দিত সিকলিড বিশেষজ্ঞ কার্লসন ১৯৯৭, ও কোনিংস ১৯৯৫ এর মতে)।

প্রাকৃতিক বাসভূমি: তানজানিয়ার পূর্ব উপকূল তথা মালাউই হ্রদের উত্তর দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পাথরের খাঁজ গুলোই এদের প্রধান বিচরণক্ষেত্র। হ্রদের উপরিভাগ থেকে মোটামুটি তিন মিটারের মধ্যে যেখানে জলের প্রবাহ একটু বেশির দিকে সেখানেই এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

শারীরিক গড়নের দিক দিয়ে পরিণত অবস্থায় পুরুষ Ndumbi চার ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হতে পারে যেখানে স্ত্রী মাছ একটু ছোট, ইঞ্চি তিনেকের হয়। বেশিরভাগ আফ্রিকান মবুনাদের মতোই এদের পুরুষদের শরীরেই রঙের ছটা অনেক বেশি দেখতে পাওয়া যায়। নীলাভ সাদা বর্ণের ওপর মাথার লাল সিঁদুরে রঙ এক অনবদ্য রূপ দেয় এদের। যদিও স্ত্রী রা হালকা ধূসর বর্ণের হয়। খাবারের ব্যাপারে Ndumbi নিরামিষাশী হলেও একেবারেই যে প্রাণীজ প্রোটিন এদের খাদ্য তালিকাতে থাকে না তা বলা যায় না। প্রাকৃতিক আবাসস্থলে পাথরের খাঁজে খাঁজে জন্মানো জলজ শৈবালের সাথে সাথে ছোট ছোট phyto plankton ও পোকা মাকড়ের ডিম সবই এদের খাদ্যতালিকা তে চলে আসে। তবে তার পরিমান কিন্তু সীমিত। Aquarium এর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা কে একটু মাথায় রেখে এদের খেতে দিলেই আর কোনো সমস্যা থাকে না। স্পিরুলিনা উপাদান যুক্ত প্যালেট ফুড বা ফ্লেক ফুড দিতে পারেন। মাসে একবার করে brine shrimp সাথে অল্প daphnia ও রাখতে পারেন খাদ্যতালিকা তে , তবে সেটা শুধুমাত্র স্বাদ বদলের জন্য।

যেকোনো প্রজাতির বাসস্থান নির্মাণের সময় তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলের কথা খেয়াল রাখলেই আর কোনো সমস্যা থাকেনা। তাই এদের জন্য ট্যাংক তৈরির সময় বালির সাবস্ট্রেট দিয়ে তার উপর প্রচুর পাথর দিন, যেহেতু এরা একটু জলের প্রবাহ পছন্দ করে একটু ভালো flow এর ব্যবস্থা করতে পারেন। ব্যস ! তৈরি হয়ে গেল Ndumbi র আদর্শ ঠিকানা। যদিও এরা এতটাই লাজুক স্বভাবের আপনার ইচ্ছে মতো হয়তো দর্শন দিতে নাও পারে তবুও এমন ট্যাংক গঠন করলে মাছ যে খুব ভালো থাকবে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

Red top Ndumbi খুব সহজেই প্রজনন করে। পূর্বেই বলেছি একমাত্র প্রজননের সময় এদের আগ্রাসী আচরণ প্রখর হয়ে ওঠে। যেহেতু এরা মাউথব্রুডার তাই ডিম পাড়ার পর স্ত্রী মাছ মোটামুটি কুড়ি থেকে বাইশ দিন ডিম মুখে রাখে, তারপর আস্তে আস্তে বাচ্চা বড় হলে মায়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, এবং নিজেদের মতো সাঁতার কাটতে শেখে।

ব্যস, তাহলে সন্ধান পেয়ে গেলেন মালাউই হ্রদের পঞ্চরত্নের ! আর দেরী না করে ঝটপট ঠিক করে নিন কাদের আপনি ঠাঁই দেবেন আপনার সাধের কাঁচবাক্সে। আর তাদের রাখবেন কিভাবে? কোনো চিন্তা নেই। আমরা তো আছি ! পাতা উল্টোলেই পেয়ে যাবেন সবরকম মালাউই সিকলিডদের রাখার খোঁজ খবর 'মালাউই সিকলিডদের রাখার সহজপাঠ"এ। তাই আপনার মাছ-ঘর দ্রুত মালাউই সাজে সেজে ওঠার অপেক্ষায় রইলাম আমরা।

সব ছবি: ইন্টারনেট

।। মালাউই সিকলিডদের রাখার সহজপাঠ।।

অরিত্র ভট্টাচার্য্য

‘মেছোবই’ পুজো সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ কি ইতিমধ্যেই আপনারা জেনে গেছেন। আর এই লেখা পড়ার আগেই আপনারা পড়ে ফেলেছেন মালাউই সিকলিডদের বাসস্থান ও তাদের গঠনগত বিবর্তনের কথা আর সাথে সাথে কিছু জনপ্রিয় মবুনা আর হ্যাপলোক্রোমিস দের কথাও। সাথে সাথে আপনাদের ধারণা হয়ে গেছে মবুনা, হ্যাপলোক্রোমিস আর পিককদের সাধারণ তফাৎ সম্পর্কে। এতো কিছু পড়ে নিশ্চয়ই আপনার মনে হয়েছে যে এদের যদি কোনোভাবে আমার অ্যাকোয়ারিয়ামে ঠাঁই দিতে পারতাম! বা যাঁরা ইতিমধ্যেই এদের পোষ্য করে নিয়েছেন তাঁদেরও এসব পড়ার পর মনে হচ্ছে যদি এদের আরেকটু ভালোভাবে রাখতে পারতাম! তাই এবার না হয় আলোচনা করি মালাউই সিকলিডদের ট্যাঙ্কে রাখার সুলুক সন্ধান নিয়ে। মাছ পুষিয়েদের মধ্যে এই মালাউই সিকলিডদের এতো বেশী কদরের কারণ প্রধাণত দুটো, একটা হলো তাদের রঙ এবং আরেকটি হলো তাদের বিহেভিয়ার। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সেই মাছ পুষিয়েদের কাছে মালাউই সিকলিডদের নিয়ে মাথা ব্যথার কারণও হলো এই দুটোই! নয় রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, নয় তুমুল মারামারি করে ফাটিয়ে দিচ্ছে। তাই মাছ রাখার সময় এই ব্যাপার গুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। চলুন এবার দেখে নিই মালাউই সিকলিডদের ট্যাঙ্কে পোষার কিছু FAQ বা প্রশ্ন যার উত্তর খুঁজে পেলেই এদের পোষা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

১) ট্যাঙ্ক সাইজ কিরম করবো?

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো কমপক্ষে তিন ফুট আর বেশীপক্ষে পুকুর। মানে মালাউই সিকলিডদের রাখার সর্বোচ্চ সাইজ কিছু বলা মুশকিল। তিন থেকে চার ফুট ট্যাঙ্কে ছোট মবুনা যেমন ইয়োলো ল্যাব, এসেই, যোহানি, ডেমাসনি এদের কলোনি রাখা গেলেও হ্যাপদের রাখার জন্য ছয় থেকে আট ফুট লম্বা ট্যাঙ্ক লাগবেই কমপক্ষে, কারণ এরা ফ্রি সুইমার। আর কোনো কারণে মারামারি লাগলে পর্যাপ্ত জায়গা না পেলে তা প্রাণঘাতী হতে বেশী সময় লাগবে না। সেরম হলে একজন ডমিনেন্ট মেলই সাঙ্ঘাতিক অ্যাগ্রেসিভ হয়ে বাকিদের কোণঠাসা করে দিতে পারে। আর তখন পর্যাপ্ত জায়গা না থাকলে কোণঠাসা মাছগুলোর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। স্ট্রেসে চলে গিয়ে খাবার দাবার না খেয়ে মরে পর্যন্ত যেতে পারে। তাই ৮-১০ টা মাছের কলোনি করলে তাদের নিজেদের পর্যাপ্ত টেরিটোরি তৈরী করার মতো বড়ো ট্যাঙ্ক করতে হবে। আর বড়ো ট্যাঙ্ক করতে গেলে সেই মতো ৮-১০ মিমি কাঁচ এবং সাথে টানা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তলায় কমপক্ষে ১২ মিমি কাঁচ দেওয়া দরকার কারণ বেশী জলের চাপ এবং সিকলিড ট্যাঙ্কের পাথরের চাপ ওই কাঁচকে সামলাতে হবে।

২) মালাউই সিকলিড কিভাবে রাখবো?

হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। ‘কিভাবে’ রাখবেন! কোন সিকলিডদের রাখবেন সেটা তো নিশ্চয়ই ট্যাঙ্ক বানানোর আগেই ঠিক করে নিয়েছেন কারণ সেইমতো আপনাকে ট্যাঙ্ক বানাতে হবে। এবার তাদের কিভাবে রাখবেন সেটাও আপনাকে বাছতে হবে। সাধারণত মালাউই সিকলিডদের দুভাবে রাখা হয়। একটা হলো সব মেল মাছকে একসাথে রাখা। এর সুবিধা হলো যেহেতু মালাউই সিকলিডদের মধ্যে মেলরা বেশী রঙিন হয় তাই গোটা ট্যাঙ্কটায় বিভিন্ন রঙবেরঙের মাছে ভরে থাকে। তবে এক্ষেত্রে মবুনার সাথে হ্যাপ এভাবে

মিলিয়ে মিশিয়ে মেল রাখা একদম ঠিক না কারণ হ্যাপ সাইজে বড়ো, বেশী আক্রমণাত্মক ও মাংশাসী। এই পদ্ধতিতে ট্যাঙ্কে ফিমেল থাকে না বলে ব্রিডিং অ্যাগ্রেসন ও সেভাবে থাকে না সব মেলদের মধ্যে। কিন্তু সব মেল হলে ট্যাঙ্কে জায়গাও বেশী লাগে কারণ সবাই আক্রমণাত্মক। তবে একই সাথে ফিমেল না থাকলে মেলদের ব্রিডিং বিহেভিয়ার এবং সেই সময়কালীন রঙ (যা চোখ ধাঁধানো হয় কারণ মহিলাদের ইমপ্রেস করতে কেউই কম যায় না) দেখা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আর দ্বিতীয় উপায় হলো কোনো প্রজাতির সিকলিডকে মেল-ফিমেল মিলিয়ে সঠিক অনুপাতে একটা কলোনিতে রাখা যাতে তারা তাদের ব্রিডিং-এর সুযোগ পায়। মালাউই সিকলিডরা সাধারণত হারেম প্রথায় বিশ্বাসী,মানে একজন মেল এর সাথে ৫-৭ জন ফিমেল নিয়ে (প্রজাতি ভেদে সংখ্যা এদিক-ওদিক হতে পারে) একটা প্যাক তৈরি হয়। এক্ষেত্রে যে ডমিনেন্ট মেল হয় তার রঙ এবং বিহেভিয়ার সর্বাধিক দেখা যায়। আর যদি কলোনিতে একাধিক পুরুষ থাকে তাহলে ডমিনেন্ট পুরুষ অন্য পুরুষটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু কোনও কারণে যদি সেই অর্ডার পালটে যায়, মারামারির মাধ্যমে যদি অন্য পুরুষটি ডমিনেন্ট হয়ে যায় তখন পরাজিত রাজার কপালে অশেষ দুঃখ থাকে। ট্যাঙ্ক বড়ো না হলে, বা লুকোনোর যথেষ্ট জায়গা না থাকলে মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সব মিলিয়ে এই পদ্ধতিতে সিকলিডদের রাখলে সবার সমান রঙ দেখা না গেলেও (যেহেতু ফিমেল রা তুলনায় অনুজ্জ্বল হয়) তাদের প্রাকৃতিক আচার-আচরণ অনেক ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। সাথে উপরি পাওনা হলো ছোট ছোট নতুন সিকলিডদের আপনার ট্যাঙ্কে আগমন।

৩) বেশ, ট্যাঙ্কও বানালাম, কিভাবে রাখবোও ঠিক করলাম। এবার সঠিক স্কেপ করবো কিভাবে?

মালাউই সিকলিড বলতেই আমাদের মনে যেটা চলে আসে সেটা হলো পাথর, পাথর আর পাথর। মালাউই হ্রদের তলদেশে থাকার ফলে সেখানের বড়ো ছোট পাথরের খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে থাকা, তলার বালি খোঁড়া এসব মালাউই সিকলিডদের মজ্জায় ঢুকে গেছে। তাই আপনার ট্যাঙ্কে মালাউই সিকলিডদের স্কেপ করতে গেলে প্রথমেই যেটা চাই সেটা হলো বালি আর পাথর। সাবস্ট্রেটের বালির স্তর মোটামুটি ইঞ্চি দুয়েক দরকার আর সেই বালি যতো সূক্ষ্ম হবে ততো ভালো কারণ এরা বালি খোঁড়াকে এদের জীবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বলে গণ্য করে। খাবার খুঁটে খাওয়া, প্রজননের সময় পিট বানানো, লুকোনো সব ক্ষেত্রেই এরা বালি খোঁড়ে। তাই বালি সূক্ষ্ম না হলে এদের আহত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। এবার সেই বালির স্তর দেওয়ার পরে দিতে হবে পাথর। পাথর হতে হবে বড়ো ছোট মেশানো এবং মসৃণ, যাতে ধারালো খাঁজে মাছের গা ঘষে না যায়। ছোট মবুনারা প্রচুর পাথরের খাঁজ পছন্দ করে ওই খাঁজে লুকোনোর জন্য। কিন্তু হ্যাপদের ক্ষেত্রে পাথর দেওয়ার সাথে সাথে তাদের সাঁতার কাটার জন্য বেশ কিছুটা খোলা জায়গা রাখাও দরকার, কারণ ওরা ফ্রি সুইম স্পেস পছন্দ করে। এবার এই বড়ো পাথর দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে পাথরগুলো কাঁচের গায়ে লেগে না থাকে, তাহলে কাঁচে চিড় ধরতে পারে। আর তলায় থার্মোকলের ওপরে পাথর দেওয়ার চলও আছে তলদেশের কাঁচকে পাথরের সরাসরি ধাক্কা থেকে এড়ানোর জন্য। কারণ সিকলিডরা প্রায়শই পাথরের তলায় বালি খুঁড়ে পাথরকে আলগা করে দেয়। মালাউই সিকলিডদের ট্যাঙ্কে লাইভ গাছ দেওয়ার সুযোগ খুব একটা নেই কারণ প্রথম কথা হলো সাবস্ট্রেট হিসাবে মাটি দেওয়া সম্ভব নয়, আর দ্বিতীয়তঃ সিকলিডদের বালি খোঁড়ার প্রবণতার ফলে কোনও গাছের গোড়া শক্ত হতে পারে না, ওরা খুঁড়ে বালি থেকে তুলে দিয়ে শিকড়, পাতা ছিঁড়ে দেয়। তাও কোনোভাবে সম্ভব হলে ভ্যালিসনেরিয়া জাতীয় গাছ দেওয়া যায়।

৪) বেশ। বালি পাথর জোগাড় করে নেবো নাহয়। কিন্তু জল? আসল ব্যাপার তো ওটাই! জল কিরম চাই?

মালাউই সিকলিডদের বড়ো সুবিধা হলো এরা বেশী টিডিএস এর জলে স্বচ্ছন্দ। মানে এদের জন্য আপনাকে আর.ও, জারের জল এসব কিছু শৌখিন জিনিস করতে হবে না। এমনি কলের জল ই যথেষ্ট। এদের জন্য টিডিএস ৭০০-৮০০, পি.এইচ ৭-৮ আর উষ্ণতা ২৫-২৮° সেলসিয়াস ঠিকঠাক। এবার উষ্ণতা বললেই যে কথাটা মাথায় আসে সেটা হলো শীতকালে হিটার দেওয়া দরকার কিনা। এক্ষেত্রে বলা উচিত দরকারের থেকেও দরকার হলো মাছ ভালো রাখা, আর সেক্ষেত্রে শীতকালে হিটারের বিকল্প নেই। এতে মাছ ভালো থাকবে, শীতকালীন রোগবালাই এর সম্ভবনা কমবে। তবে এই সব কিছুর আগে একটা জিনিস করা খুব প্রয়োজন, সেটা হলো মাছ ছাড়ার আগে ট্যাঙ্কের জল 'তৈরী' করা, নাইট্রোজেন সাইক্লিং করা। পুরোনো কোনো ফিল্টার মিডিয়া নতুন ট্যাঙ্কে দিয়ে বা পুরোনো ভালো ট্যাঙ্কের জল নতুন সিকলিড ট্যাঙ্কের জলের সাথে মিশিয়ে কমপক্ষে একমাস ফিল্টার চালিয়ে, আলো জ্বালিয়ে জলকে সাইকেল করতে হবে যাতে ট্যাঙ্কে যথেষ্ট পরিমাণ বেনিফিসিয়াল ব্যাকটেরিয়া তৈরী হতে পারে। তবেই সেই নতুন ট্যাঙ্কের জল মাছ ছাড়ার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে।

৫) বাঃ! তবে এই যে ফিল্ট্রেশন, আলো এসব বললেন, তা এগুলো কিরম দিতে হবে? কিরম ফিল্টার দেওয়া দরকার মালাউই সিকলিড ট্যাঙ্কে?

মালাউই সিকলিডদের সর্বোচ্চ রঙ দেখতে গেলে আপনাকে আপনার ট্যাঙ্ক সর্বোচ্চ পরিমাণে পরিষ্কার রাখতে হবে। আর ইতিমধ্যেই নিশ্চয়ই ট্যাঙ্কের সাইজ দেখে আন্দাজ করে নিয়েছেন যে এতো বড়ো ট্যাঙ্কের জল পরিষ্কার রাখা, ক্ষতিকর পদার্থ তৈরী হতে না দেওয়াটা খুব একটা সহজ কাজ না। মালাউই এমনিতেই খাবার ফেলে ছড়িয়ে খেতে পছন্দ করে। তার সাথে আছে পাথরের খাঁজে, পাথরের তলায় থার্মোকল দিলে তার খাঁজে জমা নোংরা পরিষ্কার করা। ফলে ওই স্পঞ্জ বা পাওয়ার ফিল্টারে বিশেষ কাজ হবে না। হ্যাপ বা পিকক ট্যাঙ্ক হলে টপ ফিল্টার ও পর্যাপ্ত নয়। ক্যানিস্টার বা সাম্প হলো সবথেকে ভালো অপশন। খেয়াল রাখতে হবে ট্যাঙ্কের জল যেন সবসময় ফ্লো এর মধ্যে থাকে, কোনো ডেড স্পট (যেখানে জলের ফ্লো না যাওয়ার ফলে নোংরা জমে) তৈরী না হয়, তাহলেই কিন্তু অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট ইত্যাদি ক্ষতিকর জিনিস তৈরি হবে। এই সাম্প বা ক্যানিস্টার ফিল্টারের সাথে আরও ভালো ফিল্ট্রেশনের জন্য টপ বা ইন্টারনাল পাওয়ার ফিল্টার যোগ করতেই পারেন। মোট কথা মালাউই সিকলিড ট্যাঙ্কের ফিল্ট্রেশনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং সেই বুঝে আপনাকে ট্যাঙ্কে এক এবং একাধিক ফিল্টার যোগ করতে হবে যতোক্ষণ না জল কাঙ্খিত পরিষ্কার হচ্ছে। এক্ষেত্রে 'অধিকন্তু ন দোষায়' নীতি নেওয়াই ভালো।

৬) আর আলো কি করবো?

মালাউই সিকলিডরা যে প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকে সেই মালাউই হ্রদের মধ্যে আলো ভালোই যায়, ফলে আপনি সাদা উজ্জ্বল আলো আপনার ট্যাঙ্কে দিতে পারেন। তাতে আপনার ট্যাঙ্কের মাছ রঙও দেখাবে এবং সাথে সাথে আপনার পাথরের ওপর শ্যাওলা পড়বে। এই শ্যাওলা একই সাথে ট্যাঙ্কে একটা প্রাকৃতিক ভাব তৈরী করে, সাথে সাথে মবুনাদের মতো নিরামিষভোজী মাছেদের খাদ্য হিসাবেও কাজ করে।

৭) নিরামিষভোজী সে ইয়াদ আয়া, ট্যাঙ্ক করলাম, জল করলাম, মাছ রাখলাম, কিন্তু তাদের খেতে দেব কি?

এই একটি ব্যাপারে মালাউই সিকলিডদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। এরা 'পাইলেই খাই' নীতিতে বিশ্বাসী। তবে সেই আনন্দে আপনি যেন আবার বেশী পাইয়ে দেবেন না, তাহলেই মুশকিল। মালাউই সিকলিডদের মধ্যে মবুনারা নিরামিষভোজী, এবং হ্যাপ আর পিককরা আমিষভোজী। সেই মতো এদের খাবার দিতে হবে। এরা প্যালেট খাবারে অভ্যস্ত। এমনকি মবুনাদের জন্য বাড়িতে কড়াইশুঁটি জাতীয় সব্জি একটু সিদ্ধ করেও নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে পারেন মাঝেমধ্যে। তাই এদের জন্য খাবার পাওয়াটা সমস্যা নয়, সমস্যা হলো এদের পরিমাণ মতো খাবার দেওয়া। দিনে সর্বোচ্চ দুবার এদের এমন পরিমাণে খাবার দিতে হবে যাতে এরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই খাবার শেষ করে ফেলতে পারে। খাবার বেশী হলেই সেটা মাছের শরীরে সমস্যা করতে পারে,সাথে

সাথে ওই খাবার পাথরের খাঁজে জমে গিয়ে জল দূষিত করতে পারে। আরো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যাতে ট্যাঙ্কের সব মাছ খাবার খাওয়ার সুযোগ পায়। কারণ অনেক সময়ই এরম দেখা যায় যে ডমিনেন্ট মেল বাকিদের খেতে দেয় না। সেদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে খেতে দেওয়ার সময়।

এই হলো মোটামুটিভাবে মালাউই সিকলিডদের রাখার সহজপাঠ। তবে এদের রাখতে গেলে এই সমস্ত বাইরের জিনিসের সাথে আপনার নিজস্ব একটা জিনিস দরকার, সেটা হলো ধৈর্য্য। অন্যান্য মাছের তুলনায় এরা দীর্ঘজীবী হয়, তাই এক দুই বছর ট্যাঙ্কে রাখলেও এরা অনেক সময় ম্যাচিওর অবস্থার রঙ দেখাতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে রাঞ্চোরদাস বাবাজীর কথাই নাহয় একটু পালটে বলি, রঙের পিছনে না দৌড়ে ধৈর্য্য ধরে এদের ভালো ও সুস্থ রাখতে চেষ্টা করুন, তাহলে রঙ এদের পিছনে দৌড়ে আসবে।

সব ছবি: ইন্টারনেট

কুমকুম

BOUTIQUE

BE EXCLUSIVE, BE DEVINE, BE TRADITIONAL WITH ETHNIC

Saree Blouse Jewellery

Wholesale and Retail

Contact : 943269415

Kumkum
Boutique

।। আফ্রিকান সিকলিড চর্চার জনক ডেভিড লিভিংস্টোন।।

শ্রয়ণ ভট্টাচার্য্য

১৩২৩ সনের 'সন্দেশ' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় এক মিশনারি ভদ্রলোকের জীবনী সম্বন্ধে কলম ধরলেন সুকুমার রায়। স্কটল্যান্ডে জন্মে আফ্রিকা মহাদেশে তার অবাধ বিচরণ ও সেখানকার আদিবাসী, প্রকৃতির সাথে তার জীবনের একটা বৃহৎ অংশের কথা সেখানে তুলে ধরলেন সুকুমার রায়। সেই ভদ্রলোকের নাম ডেভিড লিভিংস্টোন। স্কটল্যান্ড এক গরীব তাঁতির ঘরে জন্মে অল্প বয়সেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছিলেন তিনি। শুরুর দিকে এক তুলো কারখানার চাকরি নেন তিনি। এখানেই তাঁর ভাগ্য ফিরতে শুরু করে। কারখানার মালিকের সুনজরে এসে তিনি সুগো শহরে ডাক্তারিতে ভর্তি হন। পরে ধর্মশিক্ষার পাঠও গ্রহণ করেন এখান থেকে। তখন বিশ্ব জুড়ে ইউরোপীয়দের রমরমা বাজার। ঔপনিবেশিক শাসনের সাফল্যের সাথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্ম, মূলত খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে ব্যাপক জোর দেন ইউরোপীয়রা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই আফ্রিকাও তখন ইউরোপীয় উপনিবেশ। একে একে অনেক নিত্যনতুন প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কার হয়ে চলেছে আফ্রিকাতে। এইসময় ডেভিড মিশনারি দায়িত্ব নিয়ে আফ্রিকাতে আসেন। ইচ্ছে ছিল সুদূর চীন দেশে পাড়ি জমানোর। কিন্তু ১৮৩৯ এর আফিম যুদ্ধের কারণে সেটা সম্ভব হলো না। পা বাড়াতে হলো দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে।

আফ্রিকায় এসে লিভিংস্টোনের স্বপ্নালু চোখে ভর করলো নতুন স্বপ্ন। মহাদেশেটির অভ্যন্তর থেকে সমুদ্রতট পর্যন্ত একটি সুগম্য পথ খুঁজে বের করতে চাইলেন তিনি- আফ্রিকার সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য এবং বিবিধ বৈচিত্র গোটা পৃথিবীর সামনে মেলে ধরার উদ্দেশ্যে। এখানে এসে প্রথম তিনি একটি প্রকান্ড নদীর উৎসের সন্ধান পান। সে নদীটি আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় তিনটি দেশের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। নদীটি হল বিখ্যাত নীলনদ। অভিযাত্রীক জীবনে এটি তাঁর অন্যতম সেরা একটি ঘটনা। এই ঘটনার পর তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। অভিযানের নেশায় যখন তিনি মত্ত তখন সামনে এক নতুন সমস্যা এসে হাজির হল। তিনি যে পথ ধরে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছিলেন সেটা পর্তুগিজ জলদস্যু ও আরব ব্যবসায়ীদের দখলে। সেখানে যখন তখন লুঠপাঠ লেগেই আছে। স্থানীয় মানুষদের ধরে ক্রীতদাস তৈরী যেন একেবারে রোজকার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এদিক দিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া বাণিজ্যের জন্য এই পথটি একে বারেই অনুকূল নয় বিট্রেনবাসীদের জন্য। অগত্যা কালাহারি মরুভূমি পার হয়ে উত্তর পশ্চিমে রওনা দিলেন তিনি। তবে এ যেন অসীমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। দিনরাতে চলাচল, জলের অপ্রতুলতা তার শরীর নিতে পারল না। দ্রুত জ্বরে পড়লেন তিনি। ব্যস, যাত্রা আপাতত বন্ধ। তবে তিনি সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। একটু সুস্থ হতেই আবার যাত্রা শুরু।

নানা পথ, বাঁক ঘুরে তিনি এসে পৌছোলেন জাম্বেসি নদীর তীরে। তার আগে কোনো বিদেশি এই খানে পা রাখেননি। স্থানীয় লোকেদের সাথে আলাপ হয়ে জানতে পারলেন যে এখানে এক অপরূপ সুন্দর ঝরণা আছে। তারা সেই জায়গাটাকে ধোঁয়া গর্জনের পাহাড় বলে। মনের ইচ্ছেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না ডেভিড। স্থানীয় লোকেদের নিয়ে চললেন সেইখানে। তিনি পৌঁছে রীতিমতো হতবাক হয়ে গেলেন। এ যেন স্বর্গ! পাহাড়ের ওপর থেকে

প্রায় তিনশ হাত খাড়া ঝরণা এসে পড়ছে। তার জলীয় বাষ্পের ধোঁয়া প্রায় দুশো হাত ওপরে উঠে এখানে এক মায়াবী রূপকথার সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়দের ভাষায় এই জলপ্রপাতের নাম মোসি-ওয়া-তুনিয়া। আজ যাকে গোটা বিশ্ব 'ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত' নামে চেনে।

প্রথমবারের মতো জাম্বেসি নদীর অভিযানের পর ডেভিড বিট্রেনে চলে আসেন। তখন তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম অভিযাত্রী যিনি আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অংশ আবিষ্কার করেছেন। এরজন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে যথাযথ সম্মান দেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার নাম বিট্রেনে ছড়িয়ে পরে। তবে বেশিদিন এখানে মন টিকলো না ডেভিডের। আফ্রিকাতে যে সব জায়গা তিনি দেখেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গা এখানো আর দেখা বাকি। তবে মনের ইচ্ছের সাথে পকেটের জোগানের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তাঁকে সমস্যায় ফেললো। সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে না পেলেও স্থানীয় বন্ধুদের থেকে সাহায্য পেলেন তিনি। সঙ্গে তিনি নিলেন তাঁর নিজের যৎসামান্য অর্থ। এই নিয়েই আবার পাড়ি দিলেন আফ্রিকার উদ্দেশ্যে। এবারের গন্তব্য মিশর। সেখানে হ্রদের দেশের কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। এবার সেই জায়গায় যাওয়ার পালা। বেশ খানিক জায়গা অতিক্রম হওয়ার পর তিনি মিশরের কাছে এক বিশাল হ্রদের সন্ধান পেলেন। যার এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত দেখা যায় না। স্থানীয় লোকেদের কাছে এই হ্রদের নাম জানতে চাইলে, তারা বলে এই হ্রদের নাম 'নায়াসা'। আসলে স্থানীয় অর্থে নায়াসা শব্দের মানেই হল লেক বা হ্রদ। ডেভিড সেটা বুঝতে না পেরে হ্রদটিকে নায়াসা নামেই অভিহিত করেন। পরবর্তীতে পর্তুগিজ মানচিত্রেও এই হ্রদের নাম নায়াসা হিসেবেই লেখা হয়। কোথাও আবার একে নায়াসাল্যান্ড নামেও ব্যাখা করা আছে। এই হ্রদের মধ্যে তিনি প্রথমবারের মতো কিছু অদ্ভুত মাছের সন্ধান পেলেন। যাদের দেখতে বেশ জমকালো। এর আগে তিনি এমন মাছ কোথাও দেখেন নি। তার পরের অভিযানে তিনি তার বন্ধু কির্ককে এখানে নিয়ে আসেন। কির্ক এই মাছকে শুটকি করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাঠায়। এখান থেকে সেই মাছের পরিচিতি লাভের শুরু। এই মাছই হলো সেই মাছ যাকে এখন আমরা আফ্রিকান সিকলিড বলে চিনি এবং এই হ্রদটিই হল মালাউই হ্রদ।

বিতর্কিত বিষয় হলেও, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম জয়লাভ আসে এই মালাউই হ্রদের কাছেই। Perch ফ্যামিলির এই সিকলিড (sick-lids) এই অঞ্চলের এন্ডেমিক জলজ সম্পদ। একে কেন্দ্র করে হ্রদটিকে World heritage site হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মালাউই হ্রদের সবচেয়ে সাধারণ সিকলিড 'আবিষ্কৃত' হয়নি এবং ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়নি যতদিন না অবধি জর্জ টার্নার মাছটির নামকরণ করেছিলেন। অনুমান করা হয় যে এই প্রজাতির ১.৫ বিলিয়ন মালাউই হ্রদে বসবাস করে। তাদের মধ্যে আটশ পঞ্চাশ মিলিয়ন প্রতি বছর ধরা পড়ে। লেকের এই মালাউই মাছ বা 'চাম্বো' (স্থানীয় নাম), ভাজা বা এবং চিপস (ফরাসি ফ্রাই) মালাউই জুড়ে একটি জনপ্রিয় খাবার।

ভেভিড লিভিংস্টোনের নামানুসারে একটি সিকলিড মাছের নামকরণও করা হয়েছে, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হল *Nimbochromis livingstonii*– সাধারণভাবে লিভিংস্টোনি সিকলিড। ডেভিড তার জীবনে বেশ কয়েকবার আফ্রিকা মহাদেশে অভিযানে গেছেন। তার Missionary Travels and Researches in South Africa গ্রন্থে যার বিস্তৃত বিবরণ তিনি দিয়ে গেছেন। সেখান থেকেই আর জীবনের একটি বড় আপেক্ষের কথা জানা যায়। ১৮৬৯ সালের দিকে তিনি যখন উজিজি থেকে লুয়ালাবা হয়ে টাঙ্গানাইকা হ্রদের কাছে এসে ঘাঁটি করেন তখন সেখানেও তিনি দাস ব্যবসার ছবি দেখেন। তিনি চেয়েছিলেন দাস ব্যবসার বরাবরের মতো অবসান হোক। কিন্তু সেখানেই তিনি প্রথম দাস ব্যবসার নামে এক পাশবিক নির্যাতন দেখেছিলেন। প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ জন দাসের গণহত্যা করা হয় তার চোখের সামনে। একজন ব্রিটিশ হয়েও শেষজীবন অবধি এই কষ্ট তাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছিল। বলা যেতে পারে সভ্য মানুষের প্রতি তার ঘৃণা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, তার শেষজীবনে যখন তার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে তখন তাকে তার দেশ অর্থাৎ বিট্রেনে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন হলেও তিনি ফিরে যেতে রাজি হননি। যে আফ্রিকা তাকে সমাজে নাম দিয়েছিল, তার রূপ তিনি সারাজীবন ধরে আরোহণ করেছিলেন সেই আফ্রিকাতেই তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

Fireglow

21 WATTS | 6500K

MADE IN INDIA

Let us hear your thoughts.
Drop a message at

fireglowlighting@gmail.com

আমার প্রিয় মেইসন রিফ

তথ্যপ্রিয় দাস

মাছ পোষা যখন শুরু করেছিলাম, আফ্রিকান সিকলিড মানেই ছিলো একটা যেন আতঙ্ক। কারণ এদের যে মাছের সাথেই রাখা হোক না কেনো, সেই মাছকে যেন মারবেই মারবে। আফ্রিকান সিকলিড সম্পর্কে ধারণাও সেই সময় ছিলো খুব অস্পষ্ট। অ্যাকোয়ারিয়ামে কোন ধরনের পরিবেশে থাকে, কি খায়, কোন মাছের সাথে রাখা যায়, কিছুই ভালো করে জানতাম না। ফলে এই ধরনের মাছ একটু এড়িয়েই চলতাম।

বছর ছয়েক আগে বিভিন্ন মাছের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে হঠাৎ করেই একটা মাছ চোখে পড়ে! মাছটিকে দেখে এতোই মনে ধরে যে মাছটা থেকে যেন আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। সাদাটে নীল দেহে কালোর ডোরাকাটা দাগ। হাব ভাব যেন পুরো রাজার মতো। বুঝতেই পারছিলাম যে এই মাছ বড়ো ট্যাংক গুলোকে একাই আলো করে রাখতে পারে। তবে সে যে প্রচন্ড অগ্রেসিভ সেটাও মালুম পেয়েছিলাম তার আবভাবে। আরও পড়াশোনা করে জানতে পারলাম ওই মাছের নাম - মেইসন রিফ। স্থানীয় নাম জেব্রা চিলুম্বা। আফ্রিকার মালাউই হ্রদে পাওয়া যায়। হ্রদের উত্তর পূর্ব উপকূলের Ngara থেকে Chirwa দ্বীপের মধ্যে এদের বসবাস। খাবারদাবারের দিক থেকে অ্যালগীভোজী, মানে নিরামিষাশী। এদের ভালো রাখতে হলে জলের pH - ৭.৫ থেকে ৮.৫ এর মধ্যে হলে ভালো। জলের তাপমাত্রা ২৪-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস দরকার। বড় মাছ আকারে প্রায় ছয় ইঞ্চি অবধি হতে পারে।

যখনকার কথা বলছি তখন আমাদের এখানে এইসব মাছ আসতো না। ২০১৮ সালের মাঝামাঝি এসে এখানে এই মাছের সন্ধান পাই। কিন্তু দামটা আয়ত্তের বাইরে হওয়ায় সেই মাছ তখন আর নিতে পারিনি। অতএব টাকা জমাই, তারপর কিছুদিন পর আমার কাঙ্খিত মেইসন রিফ কিনি।

এই মাছ বাড়িতে আনার পর অবশ্য তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। যখন আনি তখন খুব ছোট মাছ ছিলো, তখনও রং ভালোভাবে বোঝা যেত না। তবে ওইটুকু মাছেরও খাওয়া নিয়ে খুব একটা সমস্যা হতো না। ডোবা প্যালেট খাবার খেতে পারতো।

তারপর একটু বড় হতে আরেকটু বড় অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছটা রাখলাম। প্রচুর লুকানোর জায়গা দিলাম। কিন্তু মেইসন এতটাই আগ্রেসিভ হয়ে থাকতো যে বাকি মাছগুলো বেরোতেই ভয় পেতো। কারো পাখনা আর অক্ষত ছিলো না।

এইভাবেই মাছটা এখনও আছে, সুন্দর রং নিয়ে অ্যাকোয়ারিয়ামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মালাউই সিকলিড পোষার আতঙ্কও কেটে গিয়ে, ওদের প্রতি আগ্রহ আর ভালোবাসাটা চেপে বসেছে।

MST

Maharaja Gold

তখনই আসবে চা এর মজা
পান করবেন যখন

মহারাজা

Available on:

Flipkart amazon

shopify meesho

+91-9531736101

www.maharajagoldtea.com

maasindhutraders@gmail.com / maharajagoldtea@gmail.com

মাছ চিত্র

মৎস্য-মার্জার কথা

গল্প ও চিত্রঃ শ্রীদীপ্ত মান্না

মৎস্য-মার্জার কথা

দেখো, এই জলাভূমিটা কত সুন্দর নাহ! আমাদের বাচ্চারা হলে খুব সুরক্ষিত থাকবে, আর ওরা এই জলা থেকে কত মাছ ধরেও খেতে পারবে।
হ্যাঁ, জলাটায় কত মাছ! ওরা খুব আনন্দে থাকবে এখানে।
প্রায় তিন মাস পর।
এই দেখো, আজ কত বড়ো মাছ পেয়েছি।
আচ্ছা বাবা, এই মাছটার স্বাদ কিরকম?
এই মাছগুলো খুব সুস্বাদু হয়। এরা খুব বড়োও হয়।

এভাবে আরও কিছু মাস কেটে যায়, বাচ্চারা আরও কিছুটা বড়ো হয়ে ওঠে।
চলো, আজ তোমাদের মাছ শিকার করা শেখাবো আমি।
জানো মা, আমার নাহ এই চ্যাঙ মাছগুলো খেতে খুব ভালো লাগে।
আর আমার শোল মাছ।
এভাবেই চলছিল, কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সেখানে দু-পেয়েদের প্রভাব পড়তে লাগলো। পুকুরে কলকারখানার দূষিত জল প্রবেশ করাতে শুরু করলো।
বাবা, ওখানে জলের রংটা পাল্টে যাচ্ছে কেনো?
ওই দুপেয়েরা কলকারখানার দূষিত রাসায়নিক জল, এই পুকুরে ফেলতে শুরু করছে!

মৎস্য-মার্জার কথা

তারপর একদিন তো হঠাৎ....
একি, ওরা কারা? কি করছে ওরা?
চল, চল! মা কে গিয়ে জানাই।
ওরা তো এই পুকুরটা বুজিয়ে দিয়ে, এই জলাভূমিটা পুরোই নষ্ট করে দিচ্ছে।
তাহলে তো আমাদের পছন্দের মাছ গুলোও সব মরে যাবে?
শুধু ওই মাছরাই না। এবার তো আমরাও শেষ হয়ে যাবো!

দু-পেয়েদের লোভ মাছদের সাথে সাথে মেছোবিড়ালদেরও শেষ করে ফেললো। খাদ্য না থাকলে, খাদকও বাঁচতে পারে না।
আমরা পারলাম না,ওই লোভীদের হাত থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে।
আচ্ছা বাবা, তুমি তো বলতে এই দুপেয়েরা আমাদেরকে তাদের রাজ্যপ্রাণী বানিয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা আমাদের যোগ্য সম্মান পেলাম না কেন?
SRIDIPTA

আগামীর মেছো

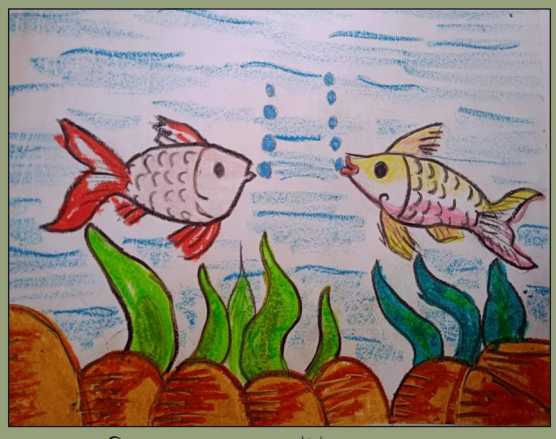

অভিমন্যু পাল, অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশানাল স্কুল

আদিত্যাংশু সেন, বয়স- ৪, জেভিয়ার কমিউনিটি সেন্টার নার্শারি স্কুল, ক্লাস— লোয়ার নার্শারি

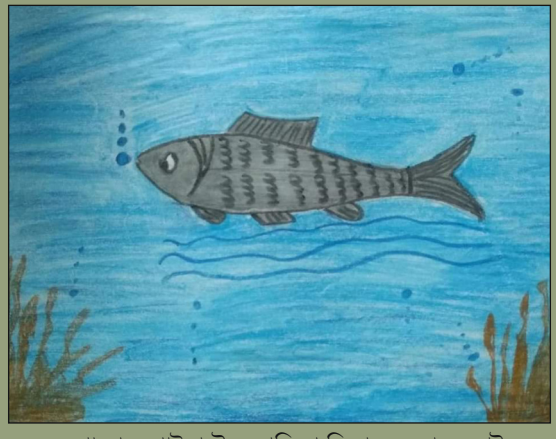

অন্বেশা রায়, খাটুরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ক্লাস- ফাইভ

অঞ্জিষ্ণু সরকার, ৬ বছর, সাউথ পয়েন্ট, ক্লাস—১

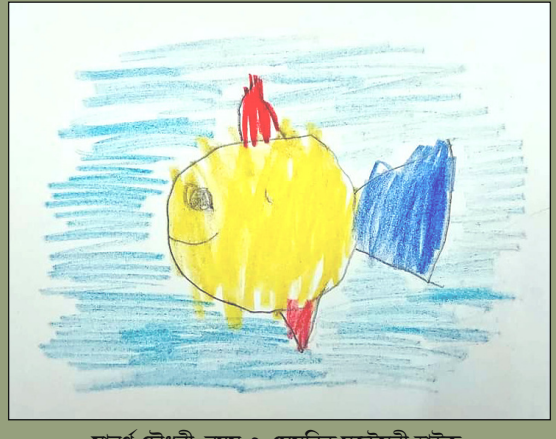

সাবর্ণ চৌধুরী, বয়স ৩, মেসনিক মন্টেসরী হাউজ, ক্লাস নার্শারি

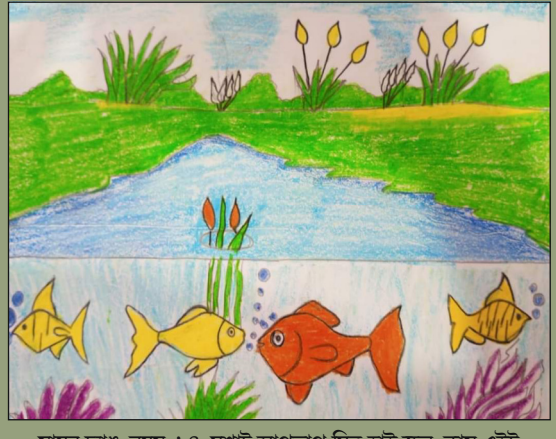

সায়ন ঢ্যাঙ, বয়স-১৪, মশাট আপতাপ মিত্র হাই স্কুল, ক্লাস এইট

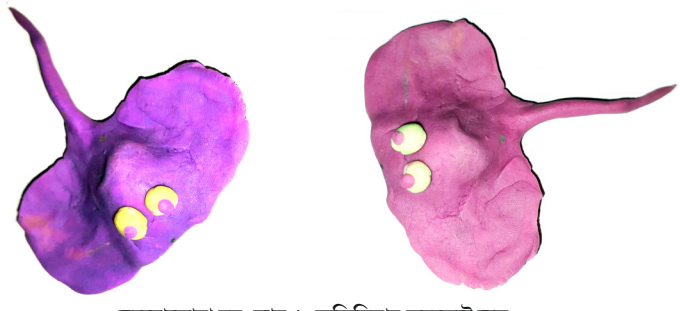

স্বচ্ছোতোয়া বর, ক্লাস ২, অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল

আগামীর মেছো

দেবাংশী চক্রবর্তী , বয়স ১০, ক্লাস— ফাইভ

শ্রীনিকা মুখার্জী-৬ বছর, লরেটো কনভেন্ট, আসানসোল. ক্লাস—১

।। জঙ্গলমহলের মৎস্যমঙ্গল ।।

রাকেশ সিংহ দেব

খাদ্য উপাদানের সহজলভ্যতা কোনো অঞ্চলের খাদ্যসংস্কৃতির মূল ভিত তৈরি করে। যে অঞ্চলে খাবারের যে উপাদান সহজলভ্য, সেই অঞ্চলে সেই উপাদানকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সেই অঞ্চলের প্রধান খাদ্যের পরম্পরা। আর এই খাদ্য পরম্পরা সুপুষ্ট করে এলাকার লোকসংস্কৃতিকে। সহজলভ্যতার কারণে ধান ও মাছ কালক্রমে জঙ্গলমহল তথা সমগ্র বঙ্গভূমির প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠে। সে কারণে দেখা যায়, শুধু খাদ্য হিসেবেই নয়, যাপিত জীবনের বিভিন্ন মাঙ্গলিক বাতাবরণেও ধান ও মাছের উপস্থিতি রয়েছে বিস্তর, হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক উপাদান। সামাজিক মনস্তত্ত্বে তাই, ধান মানেই ধন আর মাছ মানেই (নারীর ক্ষেত্রে) উর্বরতা। ধান ও মাছ থেকে কত রকমের খাবার তৈরি করা যায়, সে বিষয়ে বাঙালির রয়েছে নিজস্ব লোকায়ত জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার। নদীমাতৃক আমাদের রাজ্যে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি, ডোবা-নালা, জলাভূমি। আর এই বিস্তীর্ণ মিঠা জলের মানচিত্র আলো করেছে শত শত প্রজাতির মাছ। তাইতো এখানকার মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বর্ষার সময় গ্রাম বাংলার প্রতিটি বাড়িতেই খাবারের তালিকায় মাছের একটা পদ থাকতই। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। ভাত ও মাছ খাওয়ার রয়েছে এক সুদীর্ঘ পরম্পরা এবং রসায়ন। এই রসায়ন গড়ে উঠেছে ভূপ্রকৃতি, কৃষিকেন্দ্রিকতা, সংস্কৃতি ইত্যাদির নিরিখে। সুফলা মাটিতে ধান আর টলটলে জলে মাছ এই বাস্তবতায় যে জীবনযাপনপ্রক্রিয়া তৈরি হয়েছে শত শত বছর ধরে, তাতে সুখ ও সমৃদ্ধির নানা সংস্কার-বিশ্বাসে, মাঙ্গলিক চিন্তায় ধান আর মাছ সমানভাবে উপস্থিত। প্রতিদিনের হেঁশেল থেকে উৎসবের ভোজে তো বটেই, সন্তানসন্ততি আর ঐহিক মঙ্গল কামনায় মানুষ ধান আর মাছের কাছেই ফিরে গেছে যুগে যুগে।

সারা বাংলার পাশাপাশি জঙ্গলমহলে প্রতিদিন চর্বচোষ্য না জোটা অধিকাংশের কাছে খাল বিলের মাছই তাই হয়ে উঠেছে প্রকৃত স্বাদবিলাস। মোটা স্বর্ণ চালের ভাতের সঙ্গে যদি একটু মাছ কোনও দিন পাওয়া যায়, তবে সে বড় সুখের দিন! নদী, পুকুর, খালবিল বা বর্ষার জমা জলে মাছের খোঁজ চলে সময় সময়ে। এই জঙ্গলমহলের লাল মাটির নির্যাস আর এখানকার খাল বিল ছোট নদীর ধারা এখানকার শ্রমজীবী মানুষের রসনার সাথে সাথে পরিপুষ্ট করেছে কবির কাব্য সুষমা। কবির কাব্যধারায় এখানকার গ্রাম্যজীবনের পাশাপাশি ফুটে উঠেছে এখানকার মেছো গন্ধমাখা জীবনের কাহিনী। এই গ্রাম্য ভাবধারার বাহক হয়েছেন স্বর্গের দেবদেবী। ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়কালে এই জঙ্গলমহলের কর্ণগড়ে বসে শিবায়ণ কাব্যধারায় ‘শিব সংকীর্তণ’ পালা রচনা করেন কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য্য)। মোট আটটি পালার এই মহাকাব্যে কবি মহাদেব শিবকে উপস্থাপন করেছেন গ্রাম বাংলার এক কৃষকের চরিত্রে।

ত্রিশূল ছেড়ে তিনি ধরেছেন লাঙলের হাল। কিন্তু মহাদেব নেশাতুর, বড়ই অলস। সপ্তম পালায় কবি বর্ণনা করেছেন, অলস শিবকে চাষাবাদে নিয়োজিত করতে না পেরে গৌরি বাগদিনীর ছদ্মবেশে শিবের ক্ষেতে মাছ ধরতে এসেছিলেন। এই পালাটি বাস্তবধর্মী ও চিত্তাকর্ষক। দেবী পার্বতী মেছুনীর বেশ ধরে শিবকে কামাবিষ্ট করলে শিবের যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে তা গ্রাম্যরুচি সুলভ গানে হয়ে উঠেছে বাস্তবিক। দেবীর দৈবত্ব নয়, এই পালায় উঠে এসেছে দেবী গৌরীর এক গ্রাম্যবধূর রূপে মাছ ধরার কথা।

“ধরেন পাবদা পুঁটি পাঙ্গাস পাধীন।
চিতল চিংড়ি চেলা চাঁদকুড়ড়্যা মীন।।”

এই কাব্যধারা প্রস্ফুটিত হয়েছিল এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে। এই সময় জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। হরগৌরির সংসার যাপনের মধ্য দিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাবী ঘরকন্নার সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে। জঙ্গলমহলের মেয়েদের গানে মাছের প্রসঙ্গ তাই বারেবারে আসে। বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে গ্রামীণ মেয়েরা খুশিই হয়, কারণ নতুন জলের সাথে খলখল করে বেরিয়ে আসে নানান মাছ। আটপৌরে জীবনে এই জলের ধন এক পরম প্রাপ্তি। মাছ ধরা, রান্না করা, আস্বাদনের সাথেই মিশে থাকে দৈনন্দিন যাপনের হাজারো অভাবের মাঝে তৃপ্তির আবেশ। সারাদিন মাঠে কাজ করার পাশাপাশি অবসরে চলে চুনোপুঁটির সন্ধান। জঙ্গলমহলের মেয়েরা খালি হাতে মাছ ধরতে বিশেষ দক্ষ। হাঁটুজলে মাছ ধরে সংগ্রহ করে রাখে কাপড়ের কোঁচড়ে। রাতে ক্লান্ত শরীরে ডিবরির মৃদু আলোতে গরম ভাত আর সেই চুনোমাছের যুগলবন্দী সঞ্চার করে নতুন প্রাণশক্তির। টিপির টিপির বৃষ্টিতে ফোটে ঝুমুরের কলি।

“রিমিঝিমি হইল্য জল, পুঠিমাছে চলাচল
মাছগাকে ওল মিশাই রাধলি
ও জুড়া ঝুমুর গাহলি..।”
(ঝুমুর গান)

‘আজ রাইতে বড় জল মাছ ধরি ছলাছল
পলইয়েতে মাছ রাখলি
উদয়্যা ঝুমুর গাহলি।’
(ঝুমুর গান)

বর্ষা শুধু কবি মনকেই চঞ্চল করেনা, জঙ্গলমহলের মানুষের বুকেও দ্রিম দ্রিম বেজে ওঠে রোমান্টিকতার মাদল। প্রাণ প্রকৃতির এই মাদকতার জৌলুসে পুঁটিমাছের চোখকেও কাজল পরা বলে মনে হয়। মাছ ধরতে ধরতে তাই বারবার প্রকৃতির রূপে আত্মহারা হয়ে পড়ে যুবতি বঁধুয়া।

“ডুব্যে ডুব্যে মাছ ধরি শুধাই পুঁটি টেংরা
অ ছট দেঅরা,
মালি ফুলে বইসল্য ভমরা।”
(ঝুমুর গান)

মাছ ধরতে ধরতেই সে উপলব্ধি করে জীবনের সারৎসার। বৃষ্টি ধোয়া কদমের মতো আপ্লুত হয় হৃদয়। মন পিঁজরায় মনের মানুষকে ভালবাসায় বন্দী করতে চঞ্চল হয় হৃদয়। শিহরণজাগে শরীরে।

‘যেমন গেঁতা মাছের হাইর্‌গাঁথা-
তর্‌ মন হামার পিঁজঅরায় গাঁথা।’
(টুসু গান)

এই বর্ষা বাদলা আর জলের মাছ শুধু জঙ্গলমহলের প্রেম পিরিতির কথাই বলেনা, শোনায় তার আপন টুসু বেটির মনের কথা।

পৌষ পাব্বনে মায়ের ঘরে যেতে না পেয়ে শ্বশুর বাড়িতে মরম ব্যাথায় আদরিনী টুসুর হিয়া ছটফট করে। ডাঙায় ওঠা শোলের মতো তার হৃদয় আকুলি বিকুলি করে।

‘এতবড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে-
পরের মা কি বেদন জানে, অন্তরে পড়াঁই মারে।
আমার মন কেমন করে,
যেমন শোল মাঝে উফাইল মারে।’
(টুসু গান)

শুধু মাছ ধরলেই তো চলবেনা। পরিবারের প্রিয়জনদের মুখে রুচিকর রূপে তুলে দিতে হবে সেই জলের শস্য। জঙ্গলমহলের লোকসংস্কৃতি আলো করে রয়েছে এখানকার রান্নার নিজস্ব আঙ্গিক। উপকরণের বাহুল্যে নয় আন্তরিকতার ছোঁয়ায় এখানকার মাছের বিভিন্ন পদ হয়ে উঠেছে মনলোভা।

“বাড়ি নাময় ক্ষিরাই নদী
ভাসে আইলা ওল গো,
ওলের গরব নিমছেঁচকী,
মাছের গরব ঝোলগো।”
(টুসু গান)

“চারকন্না পুখুরটি চাইরো কুনে ঘেরা
উকানে বাইরাল মাগুর মাছ।
আঁচলে ধরিব মাছ পাথরে ঘঁষিব গ
ঝাল বাঁটনা দিয়ে মাছ লহকে রাঁধিব।”
(জাওয়া গান)

জঙ্গলমহলের রান্নাঘরের পম্পরায় পরিলক্ষিত এই পদগুলি শুধুমাত্র ক্ষুধা মেটায় না, মেটায় মানসিক পরিতৃপ্তির চাহিদা। টুসু গানে ফুটে ওঠে এক মায়ের বাৎসল্য। পরিবারের আদরের শিশুটি দীর্ঘদিনের অসুস্থতার আজ শস্যোৎসবের দিন সে অন্নপথ্য গ্রহণ করবে। বুকজোড়া মানিক ধনের পথ্য হিসেবে মা রান্না করবে বলবর্ধক মাগুরের ঝোল। তাই শিশুটির মা মনের আনন্দে গান গাইছে,

“ছাড় ছাড় ডাক্তার বাবু, আমার রামে আজ ভাত খাবে।
কি কি করব তরকারী?
মুগ মুসুরি পটলভাজা মাগুর মাছের ঝোল করি।”
(টুসু গান)

মাছ শুধুমাত্র জঙ্গলমহলের মানুষেরে কাছে রসনা পরিতৃপ্তির উপায় নয়, এ এক নোলার লোভ। এই লোভ জয় করা কার্যত অসম্ভব। দিন আনা দিন খাওয়ার সংসারে খাল বিলের দুটো মাছ যেন পানসে জীবনে রসনা বিলাসের উপকরণ — তাই কোনও কোনও গ্রাম্য গৃহবধূ বাড়িতে আসা কুটুমকে পর্যন্ত এই স্বাদের ভাগ দিতে রাজী নয়।

“মাছ ধরছিস টঁকাটঁকা, কুটুম দেখ্যে দিলি ঢাকা
কুটুম যাতে রাঁধলি তরকারি;
ল কদালদাঁতী
ভেলা তেলে ছনা বেসাতি।”
(জাওয়া গান)

এর ভিন্ন ছবিও দেখা যায়, যেখানে খাল বিল থেকে ধরে আনা মাছের স্বাদ আপন আত্মীয় কুটুম্বের সাথে ভাগ করে তৃপ্ত হন গৃহস্বামী।

“বিহাই খাঞে লে হে
মাছের কোল
বিহাইনে রাঁইধেছে
কুঁইচার ঝোল।”
(ভাদরিয়া ঝুমুর)

শুধু বড় পুকুরের বড় মাছেরা নয় এখানকার খাল বিলের প্রাকৃতিক চুনো পুঁটিরা স্বাদে কোনও অংশে কম নয়।

“ছোট খালে ছোট মাছ, বড় খালে বড় মাছ
সোনা খালে লেগেৎ শুধু পুঠিমাছ।
ঝান্টিরে জেলেঞ ঝিঙ্গী কচিমচি তুলে দে,
রাধে দেনা বাঁধুনি অডিগে সেলে।’
(সাঁওতালি লোকগান)

[অনুবাদ: ছোট খালে ছোট মাছ আর বড় খালে বড় মাছ আছে। বেড়ায় লম্বা ঝিঙ্গী বা ঝিঙা আছে। কচি-কাঁচা তুলে মাছের সঙ্গে রান্না করে দাও খুব সুস্বাদু।]

শাশ্বত দাম্পত্য প্রেম। স্বামী স্ত্রীর অভাবের সংসারে প্রতিদিন ভালো খাওয়াটাও হয়ত এক বিলাসিতা। বন বাদাড়ের শাকসব্জী না হলে খাল বিল থেকে কোঁচড় ভরে আনা গেঁড়ি গুগলি। মাঝে মাঝে তাই নতুন গ্রাম্যবধূর মুখে গুগলি গেঁড়ির স্বাদ আর রুচায় না। এসব দেখে স্বামীর হৃদয় বিচলিত হয় , সে তাঁর বঁধুয়ার মুখে দুটি মাছ তুলে দিতে চায়।

‘আমার বঁধু ভাত খায়না
গগলি তরকারি
ডাঁড়াও দেখি, দুটি দাড়কন্যা ধরি।’
(দাঁড় ঝুমুর : করম গান)

শুধু গানের সুরেই নয় ছেলে ভুলানো নানান ছড়ার ছন্দেও উঠে এসেছে মাছেদের কথা। এই জঙ্গলমহলের শিশুমননের ছান্দিক বিকাশে আজও সেগুলি চিরনতুন।

“তিরিং রিঁগা রিঁগা
পুঁঠি মাছে গীত গাহিইছে
লাইরছে বাড়ির ঝিঁগা।”
(প্রচলিত ছড়া)

“না না ভাইরে মোড় কথা শুন
বিলের মাছ চিলে খাইলা পাটা খুডিএ বুন
পাটা গেল ভাসিরে, দড়ি গেল খসি
না — না ভাই কান্দেনা কান্দে হিড়মুড়ায় বসি।।”
(প্রচলিত ছড়া)

যুগ যুগ ধরে মেছো স্বাদ ঘ্রাণ নিয়ে জঙ্গলমহলের লোকজীবন থেকে লোক-সংস্কৃতির অন্তরাত্মায় বিরাজমান জঙ্গলমহলের মৎস্যমঙ্গল কথা আজও তাই অমৃত সমান। ডাহি ডুংরির বুক ভিজিয়ে বয়ে চলা ধারাস্রোতে এইভাবেই বেঁচে থাক মাছ-মানুষের গান।

সব ছবির চিত্রগ্রাহক: অনুরাগ চৌধুরি

।। ছোটনাগপুর এবং এক অজ্ঞাতকুলশীলের গল্প।।

সপ্তর্ষি মুখার্জি

অজ্ঞাতকুলশীল তো বটেই। দিব্যি খেয়ে দেয়ে, ন্যাজ নাড়িয়ে, পাখি প্রজাপতি দেখে দিন কাটছিল; কি কুক্ষনে ঢুকে পড়লাম জলদস্যুদের আখড়ায়। আর যায় কোথা। কানকপাটিতে পিস্তল ঠেকিয়ে লেখা আদায় করছে। আমি বাপু শেষমেস রাজি হয়েছি প্রানের দায়ে, শর্ত একটাই, লিখলে ছোটনাগপুর নিয়ে লিখব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছোটবেলায় ছোটনাগপুর মালভূমির কথা পড়েছি ভূগোল বইয়ে। আরেকবার বলুন তো।

গোদা বাংলায় বলতে হলে, মালভূমি হল উচ্চভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি ৩০০ মিটার বা তার বেশী উচ্চতা, খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউখেলানো বিস্তীর্ণ ভূমি ছোটনাগপুর। এখানে গাঙ্গেয় সমভূমি ধীরে ধীরে উঁচু হতে থাকে। Deccan Plate থেকে ৫ কোটি বছর আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে, প্রচুর ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নিস পাথর সমৃদ্ধ ছোটনাগপুর গড়ে ওঠে, যার পূর্বপুরুষ গন্ডোয়ানা ল্যান্ডের অংশ ছিল। ভারতবর্ষের পাঁচটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা ও ছত্তিশগড় জুড়ে এই মালভূমি বিস্তৃত। আজ শুধু নিজের রাজ্যের আলোচনাই করব।

পশ্চিমবঙ্গের ছোটনাগপুরের গড় উচ্চতা ৩০০মিটার। গোর্গাবুরু উচ্চতম শৃঙ্গ (৬৭৭ মি)। দামোদর প্রধান নদ, এছাড়াও আছে কংসাবতী, শিলাবতী, দারকেশ্বর ইত্যদি যেগুলির জন্ম এখানেই, এবং অধিকাংশই দামোদরে মিলিত হয়। সমগ্র পুরুলিয়া, আসানসোল, দূর্গাপুর, ঝাড়গ্রাম ছাড়াও বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের এক বড় অংশ ছোটনাগপুরের অন্তর্গত। এখানে মাটির তলায় আছে খনিজের ভান্ডার, আর ওপরে হাতির দল ফেলে তাদের পদচিহ্ন। শাল, সেগুন, পলাশ, মহুয়া, অমলতাস, আসান ইত্যাদির জঙ্গলে কান পাতলে শোনা যায় প্রকৃতির ঘুমপাড়ানিয়া গান, দেখা যায় হাতি, চিতা, হায়না, বনরুই এর মত স্তন্যপায়ী ছাড়াও প্রায় ৩০০ প্রজাতির পাখি, সরীসৃপ, প্রজাপতি।

ছোটনাগপুরের জলবায়ু প্রখর। গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা থাকে ৩৮°সেন্টিগ্রেড (কখনো প্রায় ৪৫°), আবার শীতে উষ্ণতা নামতে থাকে। রাত্রে কোন জায়গায় পারদ নেমে আসে হিমাঙ্কে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর এখানে বর্ষাকাল, প্রায় ১৪০০ মিমি বৃষ্টি হয় এখানে, যা অন্যান্য ক্রান্তীয় বর্ষাবনের থেকে যথেষ্ট কম।

এবার আসি জলাভূমির কথা। না, এখানে ডুয়ার্সের মত পাহাড়ী নদী বা ঝরনা নেই, আমতা উদয়নারায়নপুরের Floodplain নেই, নেই দক্ষিন ২৪ পরগনার মত অসংখ্য নদী আর জলাভূমি। এখানের বিখ্যাত নদী বলতে দামোদর, অজয়, কাঁসাই, শিলাই, দ্বারকেশ্বর। আর আছে জলাভূমি।

জলাভূমি গুলিকে মোটামুটি ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। মনুষ্যসৃষ্ট বড় পুকুর- যেমন পুরুলিয়ার সাহেববাঁধ, বিষ্ণুপুরের যমুনাবাঁধ, লালবাঁধ ইত্যাদি; প্রাকৃতিক বড় পুকুর- পুরুলিয়ার মার্বেল লেক; আর অসংখ্য ছোট ছোট পুকুর এবং ডোবা। এই ডোবাগুলির মধ্যে ২০ শতাংশ মনুষ্যসৃষ্ট। এবং বেশীর ভাগই বৃষ্টির জলে তৈরী। তাই গ্রীষ্মকালে বেশীরভাগ পুকুরই জলশূণ্য বা প্রায় জলশূণ্য হয়ে যায়।

আচ্ছা মানুষ তো আপনি। মাছের দেখা নেই, ওদিকে ভূগোলের ক্লাস শুরু করেছেন। আসছি মশাই, আসছি। আর গৌরচন্দ্রিকা করব না। নদী আর মাছ চাষ করা পুকুর ছেড়ে দিলে, প্রাকৃতিক পুকুর গুলিতে প্রায় ৬৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। তারমধ্যে শিঙ্গি, মাগুর, আড়, ট্যাংরা, কই যেমন আছে, সেরকম রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস এর মত কুলীন ও আছে। তবে তার থেকেও বেশী পাওয়া যায় কিছু তথাকথিত অখ্যাত মাছ যেমন খলশে, পুঁটি, সরপুঁটি, তেচোখা, চ্যাং, বান, পাঁকাল ইত্যাদি। আর এই শেষোক্ত মাছগুলিই আমাদের মত দস্যুদের প্রাণভোমরা।

সেতো বুঝলাম। কিন্তু, আসল গল্প কই?

সরি স্যর, একটু বেশী কীর্তন গেয়ে ফেলছি। এই শুরু করলাম। জন্মসূত্রে বাঁকড়ী, বর্তমান আসানসোল নিবাসী আমার একটু পাখি বাতিক আছে, মানে ঐ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো জাতীয়। চাকরির ফাঁকে সপ্তাহে একদিন ছুটি পেলেও বউ এর রক্তচক্ষু আর মায়ের গলাবাজি উপেক্ষা করে (যত সহজ ভাবছেন, ততটা নয়) বেরিয়ে পড়ি দামোদরের ধারে, বিহারীনাথে বা পঞ্চকোটে। গত শীতে এভাবেই একদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে বাইক চালিয়ে আসানসোলেরই একটা জায়গায় পৌঁছালাম, যেটা নতুন ছিল আমার কাছেও। ডিসেম্বের এর সকাল, চারপাশর টাঁড় জমি আর ঘাস জমির ওপর কুয়াশার চাদর, প্যান্ট আর জুতো শিশিরে ভিজে সপসপ করছে। হঠাৎ করে কালী তিতিরের ডাক শুনে চমকে উঠলাম। পাখিটা মালভূমির বাসিন্দা হলেও, এবং বেশ কয়েকবার মোলাকাৎ হওয়া স্বত্তেও আসানসোলের বুকে এনার চাক্ষুস দর্শন কোনদিনও হয়নি, শুধু ডাক শুনেছি। আওয়াজ লক্ষ্য করে ঘাসজমির ভেতর দিয়ে যে লাল মাটির শুঁড়ি পথটা গেছে, এগিয়ে চললাম। হঠাৎ করে রাস্তাটা একটু চওড়া হয়ে নীচের দিকে নেমে গেল, আর সেইদিকে তাকিয়ে একটা অনেক পুরোনো কবিতার লাইন মাথায় এল, "অগর ফিরদৌস বার রুই জমিন আস্ত/হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত।"

একটা লম্বাটে পুকুর। বেশ বড়। তার চারপাশ ঘেরা কাশ, হোগলা, আর বড় বড় ঘাসে। সেই শীতের সকালে জলের ওপর থেকে ধোঁয়া উঠছে, আর সুয্যিমামার রাঙা আলো সেই ধোঁয়াকে তরবারি দিয়ে খানখান করে পৌঁছাতে চাইছে জল অব্দি। এরপর কি আর কোন উপায় থাকে? কালী তিতিরকে ডকে তুলে একটা পাথরের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে চেয়ে রইলাম পুকুরের দিকে। ধীরে ধীরে সূর্যের আলো জলকে করে তুললো রক্তাভ, তারো পরে সোনালী। সাদাবুক মাছরাঙ্গা, কোঁচবক আর পানকৌড়িদের প্রাণোচ্ছলতা বেড়ে গেল, মাথার ওপর রেইকি করে গেল সরাল আর বালিহাঁসের দল, ডুবডুবিরা বারবার ডুবসাঁতার দেওয়া শুরু করল, আকাশে কালো বিন্দুর মত চক্কর কাটতে লাগল কাপাসী আর শিরেবাজের দল।

নেশা লাগল জায়গাটার। এখন মাসে একদিন না গেলে ঘুম আসে না। একদিন ঠিক করলাম জলজ প্রাণীগুলোকেও এবার খোঁজা দরকার। আমার সঙ্গী আরও দুই জলদস্যু মনীশ আর শুভম কে নিয়ে একদিন শুরু করলাম কাজ। পরপর ৬ দিন কাজ করে মোটামুটি বুঝলাম যে মাছের দিক দিয়েও জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ। মাছের প্রজাতিদের মধ্যে অত্যন্ত সুলভ হল পুঁটি, সরপুঁটি, কুচে, কই, তেচোখা, পাটা খলসে, কালবোস ও মৃগেলের পোনাও চোখে পড়েছে। মাগুর না পেলেও সিঙ্গি, আড়, দেশী ট্যাংড়ার দেখা মিলেছে। পুকুর থেকে যে সরু নালা বেরিয়ে ঘাসজমিতে গিয়ে মিশেছে সেই নালায় যেমন তেচোখা আর ব্যাঙাচির ঝাঁক চোখে পড়েছে, সেইরকম হুট করে দেখা পেয়েছি বান, চ্যাং, বেলের। ধীর লয়ে পেরিয়ে যেতে দেখেছি কাঁকড়া আর শামুককে।

আরও কিছু বলবেন? নাকি রাখবেন?

এবার তো নেশা লেগে গেছে। প্রেমিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে কলম থামছে না। তবু শেষ করার আগে কয়েকটা কথা না বললেই নয়। যেভাবে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বহিরাগত প্রজাতিদের নির্বিচারে প্রকৃতিতে ছাড়া হচ্ছে (Exotic species introduction), ছোটনাগপুর মালভূমি তথা

আসানসোলও তার বাইরে নয়। আসানসোলের বেশকিছু পুকুরের স্থায়ী বাসিন্দা এখন রুপচাঁদ বা হাইব্রিড মাগুর। যদিও যে জলাভূমির কথা বলা হল, ছোটনাগপুর জুড়ে সেরকম অজ্ঞাত এবং দুর্গম জলাভূমির সংখ্যা অজস্র। তাই এখনি হয়ত এভাবে স্থানীয় মাছেরা ধ্বংস হবে না, কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে কি হবে জানা নেই। যদিও আমাদের যথাসম্ভব শক্তি দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করব, কারন, ভয়ের থেকে ভালোবাসার শক্তি বেশী, আর এই জাতীয় জলাভূমি গুলি আমাদের প্রেমিকা সম। এছাড়া আছে অবৈধ বালি ওঠানো বা পাথর ওঠানো। ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য, তথা মৎস্যবৈচিত্র্য। কাজ চলছে আদিবাসীদের স্থানীয় মাছের গুরুত্ব বোঝানোর। সফল হলাম কিনা, সেটা সময়ই বলবে।

যদি ইচ্ছে হয় আমার প্রেমিকাকে দেখার, নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। আর, এইবারে দয়া করে বিদায় দিন। বাঙ্গালীর ছেলে, কাল আবার রবিবার। ভোরবেলা প্রেমিকা ডেকেছে। হেঁ, হেঁ, বুঝলেন কিনা?

ছবির চিত্রগ্রাহক: অনুরাগ চৌধুরি

sundarban
Delta Eco Tourism

For Wildlife Tour, College Excursion and
Nature Study Camp in Sundarbans

Phone & WhatsApp - 9433669080.

।।প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের সার-বত্তা।।

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

প্ল্যান্টেড অ্যাকোরিয়াম ফার্টিলাইজেসনের ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমে কিছু বিষয় আলোচনা করা খুবই জরুরি তাই প্রথমেই ফার্টিলাইজার তার ডোজিং সম্বন্ধে বলার আগে সেই বিষয়গুলো একটু আলোচনা করা খুব দরকার।

খুব সরল ভাবে যদি আমরা একটা ছক কেটে নিই কোনো প্ল্যান্টেড অ্যাকোরিয়াম শুরু করার আগে, তাহলে আমাদের একটি সুন্দর প্ল্যান্টেড অ্যাকোরিয়াম খুব সহজেই করতে পারি।

(১) ফিলট্রেশান— একটা অ্যাকোরিয়াম শুরু করার আগে তার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার ফিলট্রেশান। প্রধানতআমরা প্ল্যান্টেড অ্যাকোরিয়ামে পাঁচ রকমের ফিলট্রেসন ব্যবহার করে থাকি ১. Hang on Back ২.Canister ৩. Internal power filter ৪. overflow filter এবং ৫. Sump filtration. প্রতিটা ফিল্টারের কাজ অ্যাকোরিয়ামের জলকে মেকানিক্যালি, বায়োলজিক্যালি এবং কেমিক্যালি পরিষ্কার করা। তবে প্ল্যান্টেড অ্যাকোরিয়ামে কেমিক্যাল ফিলট্রেশানটা ব্যবহার করা হয় না কারণ আমরা অনেক রকমের কেমিক্যাল ওয়াটার কলমে ব্যবহার করে থাকি ফার্টিলাইজার হিসেবে তাই সেগুলো যাতে কেমিক্যাল ফিলটার মিডিয়ার মাধ্যমে জলের থেকে অ্যাবসরভ না হয়ে যায়। ফিলটারের প্রথম কাজ হল বায়োলজিক্যাল ফিলট্রেসন এবং সেই সম্বন্ধে আমরা ২ নম্বর পয়েন্টে আলোচনা করব।

২. Nitrogen Cycle এবং, Water Parameters

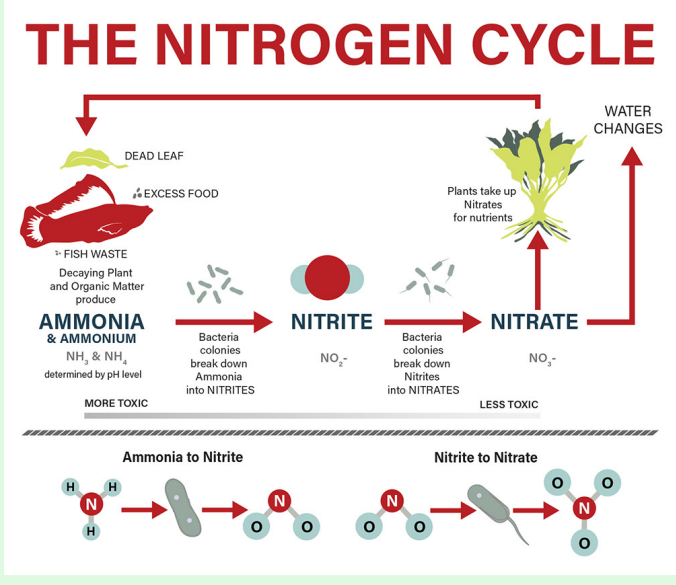

যে কোন অ্যাকোরিয়াম শুরু করার আগে সেই অ্যাকোরিয়ামের জলেতে মাছকে ও গাছপালাকে সুস্থ ভাবে রাখতে গেলে সেখানে জলকে তাদের বসবাসের উপযুক্ত করে তোলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই প্রথমে Handscape করার পরে তাতে যতটা সম্ভব শুদ্ধ জল অ্যাকোরিয়ামে ভরে তাতে ফিলটার লাগিয়ে চালু করতে হবে তারপর মাছের খাবার একটু করে প্রতিদিন দিতে হবে যাতে অ্যাকোরিয়াম Ammonia মাত্রা বাড়তে পারে এবং তারপর সেই অ্যামোনিয়াকে নাইট্রো সোমোনাস ব্যাকটিরিয়া ভেঙে নাইট্রাইটে পরিণত করে। তারপর নাইট্রো ব্যাক টিরিয়া সেই নাইট্রাইটটাকে ভেঙে নাইট্রেট সে পরিণত করে। যে নাইট্রেটকে গ্রহণ করে গাছ বৃদ্ধি পায়। যখন এইভাবে অ্যাকোরিয়ামে রাখা জল নাইট্রোজেন সাইকেল কমপ্লিট করে অ্যামোনিয়া ০, নাইট্রাইট ০ এবং নাইট্রেট ২০ থেকে ৩০ পি. পি. এম এসে দাঁড়ায় তখন নাইট্রোজেন সাইকেল সম্পূর্ণ হয় এবং অ্যাকোরিয়ামে গাছ ও মাছের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত।

(৩) Substrate- প্ল্যানটেড অ্যাকোরিয়ামেতে সাবসট্রেট হিসেবে যা ব্যবহার করা হয় তা প্রধানত তিন প্রকারের হয়ে থাকে এবং এই সাবসট্রেটগুলি প্রধানত ব্যবহার করা হয় গাছকে অ্যাকর করার জন্য দ্বিতীয়ত গাছের শিকড়ের মাধ্যমে নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই করার জন্য। তিন প্রকারের সাবসট্রেট ১. বালি ২. বালি চালা পাত্র এবং ৩. মাটি — এই মাটি গার্ডেন সয়েলও হতে পারে বা ব্র্যান্ডেড মাটি হতে পারে। এই ব্র্যান্ডেড মাটিগুলি প্রধানত মাটি, পিট্‌মস, চারকোল বা কাঠকয়লা এবং অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট দিয়ে তৈরি হয় থাকে যেটা কিনা অ্যাকোরিয়ামেতে জলের pH মেইনটেন করতে সাহায্য করে এবং গাছকে শিকড়ের মাধ্যমে নিউট্রিয়েন্টস্ সাপ্লাই করে।

(৪) লাইট– প্ল্যানটেড অ্যাকোরিয়াম খুবই সুন্দর দেখতে লাগে আর এই সৌন্দর্য শুধুমাত্র লাইটের জন্য সম্ভব হয়। কারণ লাইট না থাকলে সেই সৌন্দর্য আমরা দেখতেই পারব না। অ্যাকোরিয়ামের লাইট আমরা কি দেব? কতটা লাইট দিলে পরে গাছ বৃদ্ধি পাবে? কি কালচারের লাইট আমরা ব্যবহার করব।

প্ল্যানটেড অ্যাকোরিয়ামের লাইট নির্ধারিত করতে গেলে সবার প্রথম মাথায় রাখতে হবে তার উজ্জ্বলতা কেমন এবং কি গাছ আমরা অ্যাকোরিয়ামেতে ব্যবহার করছি। প্রধানত প্ল্যানটেড অ্যাকোরিয়ামের গাছকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— (১) ইজি ডিমান্ডিং (২) মিডিয়াম ডিমান্ডিং এবং (৩) হাই ডিমান্ডিং।

(১) ইজি ডিমান্ডিং = ১০-২০ লুমেন পার লিটার।

(২) মিডিয়াম ডিমান্ডিং = ২০-৪০ লুমেন পার লিটার।

(৩) হাই ডিমান্ডিং = ৪০ তার থেকে বেশি লুমেন পার লিটার।

প্ল্যানটেড অ্যাকোরিয়ামের গাছেদের P.A.R (ফোটোসিন্থেটিক অ্যাকটিভ রেডিয়েশান)

ওয়েভলেন্থ ৪০০-৭০০ nm।

ব্লু লাইট ৪০০-৪৬০ nm।

রেড লাইট ৫৮০-৭০০ nm।

এই ওয়েভলেন্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে যাকে গাছের ফোটোসিন্থেসিসের সুবিধা হয় গাছের স্টেমের গ্রোথ হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে ক্লোরোফিল প্রডাকশন হয়।

যে কোন ধরনের সাদা লাইট যার Kelvin ৬৫০০ থাকে এবং স্পেকট্রাম ওয়েভ লেন্থ ৪০০-৭০০ হয় সেই লাইট আমরা অ্যাকোরিয়ামে ব্যবহার করে যে কোন রকমের গাছ বড় করতে পারি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নীল আলোর ফোটন ছোট ওয়েভ লেন্থের হয়ে থাকে এবং লাল আলোর ফোটন লম্বা ওয়েভ লেন্থের হয়ে থাকে। গাছের ৮-১০টা ফোটনস্ প্রয়োজন হয়। মলিকিউল কার্বনডাইঅক্সাইড ফোটোসিন্থেসিসে বাইন্ড করার জন্য।

তাই লাল আলো নীল আলোর থেকে বেশি ফোটন উৎপাদন করে, তাই লাল আলো ফোটোসিন্থেসিসের জন্য খুবই ভালো। ফোটনকে কাউন্ট করা হয় মাইক্রোমোলস্ দিয়ে।

একটি প্ল্যানটেড অ্যাকোরিয়ামে ইজি ডিমান্ডিং প্ল্যান্টস গ্রো করতে গেলে মিনিমাম 50-60 Mmo/s/m2 (মাইক্রোমোলস্ প্রতি মিটার স্কোয়ার প্রতি সেকেন্ড), মিডিয়াম ডিমান্ডিং প্ল্যান্ট 90-100 Mm এবং হাইডিমান্ডিং 180০-

200 μmols/m2/s প্ল্যান্ট প্রয়োজন হয়।
6500K-1000 লুমেনেতে হয় , 23μmols/s/m2/s
সেই কারণে তাড়াতাড়ি গাছের গ্রোথ করার জন্য অনেকে W.R.G.B লাইট ব্যবহার করে থাকে।

CO_2 কার্বনডাইঅক্সাইড

প্ল্যানটেড অ্যাকোরিয়ামে ফার্টিলাইজার নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাকোরিয়ামেতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেওয়া হচ্ছে কিনা। কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেওয়ার কিছু পদ্ধতি রয়েছে। প্রথম পদ্ধতি প্রেশারাইসড CO_2 সিস্টেম। যেখানে হাই প্রেসারের CO_2 ধাতব সিলিন্ডারের ভিতরে ভরা থাকে এবং ভাল্ব, কন্ট্রোলার, প্রেসার গেজ, বাবেল কাউন্টার এবং কেউ কেউ সোলেনয়েড্ ভাল্ব ও ব্যবহার করেন অটোমেটিক সাপ্লাই অন্ ও সাপ্লাই অফ করার জন্য। এইবার সেই প্রেসারাইড CO_2 সিলিকন্ পাইপে মাধ্যমে অ্যাকোরিয়াম মধ্যস্থ ডিফিউসার দিয়ে জলের মধ্যে ছোট ছোট বাব্লস্ তৈরি করে ডিফিউস করা হয়। আবার অনেকে ইন লাইন CO_2 ডিফিউসার ব্যবহার করে থাকে যেখানে ফিল্টার থেকে জল অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে যাওয়ার লাইনের মধ্যে এটিকে লাগানো হয় যাতে CO_2 টি সম্পূর্ণ ভাবে জলের সঙ্গে মেশে এতে CO_2 নষ্টও কম হয় এবং সহজেই রেজাল্ট পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল DIY সিসটেম। এই পদ্ধতিতে নিজেরাই প্রয়োজনীয় CO_2 জেনারেট করে নেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে সাইট্রিক অ্যাসিড ও বেকিং সোডা পদ্ধতি সব থেকে বেশি কার্যকর আরো কয়েকটি প্রমোস্ রয়েছে যে রকম চিনি ও ইস্ট CO_2 জেনারেটার (তবে এই পদ্ধতিতে প্রেসার খুবই কম থাকে এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় অ্যাকোরিয়ামের জলের সঙ্গে দ্রবীভূত করা যায় না)।
যদি আমরা অ্যাকোরিয়ামের জলের সাথে 25-30 PPM CO_2 মেশাতে সক্ষম হই তাহলে জলের pH এক ইউনিট কমাতে সক্ষম হব। যদি ধরা যাক CO_2 অ্যাকোরিয়ামে চালু করার আগে pH 7.5 ইউনিট হয় এবং বন্ধ করবার সময় pH 6.5 হয় তাহলে আন্দাজ 25-30 PPM CO_2 আমরা দ্রবীভূত করতে সক্ষম হয়েছি।
ইজি ডিমান্ডিং গাছেদের 5-10 PPM CO_2 প্রয়োজন হয়।
মিডিয়াম ডিমান্ডিং গাছেদের 10-15 PPM CO_2 প্রয়োজন হয়।
হাই ডিমান্ডিং গাছেদের 30 ও তার বেশি PPM CO_2 প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি ফার্টিলাইজার ডেজিং করব কতটা ফার্টিলাইজার ডেজিং করব সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বলতে হয় ফার্টিলাইজার ডেজিং দু প্রকারের হয়।
প্রথম রিচ্ ফার্টিলাইজার ডেজিং বা এসটিমেটিভ ইনডেক্স (এই পদ্ধতির আবিষ্কারকের নাম টম বর্)। এই পদ্ধতিতে নিউট্রিয়েন্টস্ ডেজিং করবার পরে টেস্ট কিট দিয়ে মাপবার প্রয়োজন পড়ে না। অ্যাকোরিয়ামের জলে প্রয়োজনীয় নিউট্রিয়েন্টস অতিরিক্ত মাত্রায় থাকে। যাতে কিনা খুব হাইলাইট্ (450Mmo/s/m2/s) ফোটোসিন্থেটিক ফোটন ফ্ল্যাক্স ডেনসিটিতে ও নিউট্রিয়েন্টস্ ডেফিসিয়েনসি চোখে পড়ে না। এইবার কি ফার্টিলাইজার এস্টিমেটিভই ডেক্সে মেথডে কতটা গাছের দ্বারা অ্যাবসর্ভ হতে পারে।
নাইট্রেট NO_3 1-5PPM
অ্যামোনিয়া NH_4 0,1-0.8 PPM (যদি নাইট্রেড না ডোস্ করা হয় তাহলে খুব দক্ষ অ্যাকোরিয়াম না হলে অ্যামোনিয়া অ্যাকোরিয়ামে ডোজিং করার কোনো প্রয়োজন নেই।)
ফসফেট PO4 0.2-0.6 PPM
এই পদ্ধতি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হাইলাইট এবং জলে দ্রবীভূত থাকা বাঞ্ছনীয় এবং 25-30PPM CO_2 প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে জল পালটানো বাঞ্ছনীয়।
এস্টিমেটিভ ইনডেক্সে ফার্টিলাইজার ডোজিং এর পদ্ধতি অলটারনেটিভ ডে তে তিনদিন মাইক্রো আর তিনদিন ম্যাক্রো এবং সপ্তাহের শেষদিন 50% ওয়াটার চেঞ্জ।

Example–

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
(50% Water Change)						
Macro	Micro	Macro	Micro	Macro	Micro	No Dosing

10-20 গ্যালন
*KNO_3 -1/8 tsp
*KH_2PO_4 -1/32tsp
*K_2SO_4 -1/32tsp
*Micros-1/32tsp

40-60 গ্যালন
*KNO_3 -1/2 tsp
*KH_2PO_4-1/8tsp
*K_2SO_4-1/8tsp
*Micros-1/8tsp

60-80 গ্যালন
*KNO_3 -3/4 tsp
*KH_2PO_4 -3/16tsp
*K_2SO_4 -1/4tsp
*Micros-1/4tsp

100-125 গ্যালন
*KNO_3-1tsp+1/2 tsp
*KH_2PO_4 -1/2tsp
*K_2SO_4 -1/2tsp
*Micros-1/2tsp

উইকলি টার্গেট রেঞ্জেস্ অফ নিউট্রিয়েন্টস এন্ড CO_2
*CO_2-30 PPM
*NO_3-5-30 PPM
*K- 10-30 PPM
*PO_4-1.0-3.0 PPM
*Fe-0.2-0.5 PPM or higher
*GH range 3-5 degrees-50 PPM or high
*KH range 3-5

টোটাল ডেইলি ডোজ্ইন tsp/10 গ্যালন (PPM)
7.5 PPM NO_3 টার্গেট পৌঁছতে 463 মিলিগ্রাম্ (ইকিউভ্যালেন্ট টু 1/16tsp) KNO_3 10 গ্যালনের অ্যাকোরিয়ামের জন্য
NO_3 7.5 PPM
N-1.69 PPM
K-4.73 PPM
7.5 PPM K টার্গেটে পৌঁছতে 633 মিলিগ্রাম্ (ইকিউভ্যালেন্ট টু 1/16tsp+1/32tsp) K_2SO_4 10 গ্যালনের অ্যাকোরিয়ামের জন্য।
K-7.5 PPM
S-3.08 PPM
1.3 PPM PO_4 টার্গেটে পৌঁছতে 90 মিলিগ্রাম্ (ইকিউভেলেন্ট টু 1/64tsp) K_2HPO_4 10 গ্যালনের অ্যাকোরিয়ামের জন্য।
PO_4 -1.3 PPM
P- 0.42 PPM
K-1.07 PPM

0.2 PPM Fe টার্গেটে পৌঁছতে 116 মিলিগ্রাম্ (ইকিউভেলেন্ট টু 1/64tsp) EDTA micromix 10 গ্যালনের অ্যাকোরিয়ামের জন্য।
Fe- 0.2 PPM
Mn- 0.057 PPM
Cu- 0.003 PPM
Mg-0.043 PPM
Zn- 0.011 PPM
Mo- 0.002 PPM
B- 0.025 PPM
dGH-0.01
পারপিচুয়েল পিজারভেশন সিস্টেম (PPS) এই সিস্টেমে ফার্টিলাইজারের স্টক সলিউশন নিজে বানিয়ে ইনডিভিজুয়ালি প্রতিদিন ইউস করা যায়। এর জন্যে প্রয়োজনীয় যে সল্টগুলি আমাদের নিতে হবে সেগুলি যথাক্রমে—
ম্যাক্রোস (500ml ডিস্টিল ওয়াটারে মেশাতে হবে)
K2SO4-পটাশিয়াম সালফেট-29.3 gm
KNO3 পটাশিয়াম নাইট্রেট- 32.6 gm
KH2PO4 মনোপটাশিয়াম ফসফেট -2.9 gm
MgSO4 ম্যাগনেশিয়াম সালফেট- 20.2 gm

মাইক্রোস— (TE-ট্রেস এলিমেন্ট)- 500ml ডিস্টিল্ড ওয়াটারে মেশাতে হবে।
EDTA-Micromix-28.6gm.
এই ধরনের ফার্টিলাইজার ডোজিং এর ক্যালকুলেশান
ম্যাক্রোস-প্রতিদিন ডোজ করতে হবে 1ml পার 10 গ্যালনস্ বা 40 লিটার জলে। প্রতিদিন অ্যাকোরিয়ামের আলো জ্বালানোর আগে।
মাইক্রো-প্রতিদিন ডোজ্ করতে হবে 0.5ml পার 10 গ্যালনস্ বা 40 লিটার জলে। প্রতিদিন অ্যাকোরিয়ামের আলো জ্বালানোর আগে।
এই মাত্রায় ডোজিং করার পরে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তা হল যথাক্রমে—
1PPM No3
0.1 PPM PO4
1.33 PPM K
0.1 PPM Mg
0.05PPM TE (ট্রেস এলিমেন্ট)
প্রতি সপ্তাহে 50% ওয়াটার চেঞ্জ করা বাঞ্ছনীয়।
লো লাইট— PPS পদ্ধতিতে কম আলোর প্ল্যানটেড অ্যাকোরিয়ামে ডোজিং যথাক্রমে ম্যাক্রোস 0.5ml / 10 গ্যালনস্ বা 40 লিটার মাইক্রোম 0.25ml / 10 গ্যালনস্ বা 40 লিটার ওয়াটার চেঞ্জ 50% সপ্তাহে একবার। এই মাত্রায় ডোজিং করলে নিউট্রিয়েন্টস এর লেবেল—
7PPM No3
0.7 PPM Po4
9 PPM K
0.7 PPM Mg
0.35PPM Fe (TE)
মিডিয়াম লাইট— PPS পদ্ধতিতে মিডিয়াম আলোতে প্ল্যানটেড অ্যাকোরিয়ামে ডোজিং যথাক্রমে ম্যাক্রোস 1ml / 10 গ্যালনস্ বা 40 লিটার মাইক্রোম 0.5ml / 10 গ্যালনস্ বা 40 লিটার ওয়াটার চেঞ্জ 50% সপ্তাহে একবার। এই মাত্রায় ডোজিং করলে নিউট্রিয়েন্টস এর লেবেল—
14PPM No_3
1.4 PPM PO_4
18 PPM K
1.4 PPM Mg
0.7PPM Fe (TE)
হাইলাইট— PPS পদ্ধতিতে হাইলাইটে প্ল্যানটেড অ্যাকোরিয়ামে ডোজিং যথাক্রমে ম্যাক্রোস 2ml / 10 গ্যালনস্ বা 40 লিটার মাইক্রোম 1ml / 10 গ্যালনস্ বা 40 লিটার ওয়াটার চেঞ্জ 50% সপ্তাহে একবার। এই মাত্রায় ডোজিং করলে নিউট্রিয়েন্টস এর লেবেল যথাক্রমে —
28 PPM No_3
2.8 PPM PO_4
36 PPM K
2.8 PPM Mg
1.4PPM Fe (TE)
এই পদ্ধতির মধ্যে খুব সহজভাবেই আমরা রিচ ফার্টিলাইজার ডোজিং এবং লীন ফার্টিলাইজার ডোজিং দুটোই পদ্ধতির ব্যাখ্যা পেয়ে যাচ্ছি।
ড্রাই ফার্টিলাইজার ডোজিং সিস্টেম—টার্গেট নিউট্রিশানতে পৌঁছনোর জন্য অনেক সময় এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয় যে পদ্ধতিতে ড্রাই সল্ট ডায়রেক্ট অ্যাকোরিয়ামের জলে দেওয়া হয় 1PPM (NO_3) টার্গেটে পৌঁছতে 62Mg (ইকিউভ্যালেন্ট বা লেস দেন 1/64 tsp) KNO_3 10 গ্যালন বা 40 লিটার।
NO_3 1PPM
N-0.23 PPM
K-0.63 PPM
2.8 PPM Mg
0.1PPM (PO_4) টার্গেটে পৌঁছতে 6.94 Mg (ইকিউভ্যালেন্ট বা লেস দেন 1/64 tsp) $K2HPO_4$ /10 গ্যালন বা 40 লিটার।
PO_4 -0.1PPM
P-0.03 PPM
K-0.08 PPM
0.33 PPM (K) টার্গেটে পৌঁছতে 112 Mg (ইকিউভ্যালেন্ট বা লেস দেন 1/64 tsp) K_2SO_4 /10 গ্যালন বা 40 লিটার।
K -1.33PPM
S-0.55 PPM
0.05 PPM (Fe) টার্গেটে পৌঁছতে 29 Mg (ইকিউভ্যালেন্ট বা লেস দেন 1/64 tsp) EDTA micromix /10 গ্যালন বা 40 লিটার।
Fe -0.05PPM
Mn-0.0143 PPM
Cu-0.0007 PPM
Mg-0.0107 PPM
Zn-0.0028 PPM
Mo-0.0004 PPM
B-0.0061 PPM
dGh 0.0025
গাছের প্রয়োজন, নিউট্রিয়েন্ট সোর্স, অপটিমাম লেবেলস্ এবং মোবিলিটি
নন মিনারেল নিউট্রিয়েন্টস— গাছের ফোটোসিন্থেসিসের জন্য সরাসরি প্রয়োজনীয় নন্ মিনারেল নিউট্রিয়েন্টসগুলো হল(H) হাইড্রোজেন, (O) অক্সিজেন, এবং (C) কার্বন।
ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস্-তিনটি প্রাইমারি ম্যাক্রো নিউট্রিন্টেস্, মিনারেল নিউট্রিয়েন্টস্ (NKP) গাছের গ্রোথের জন্য এবং অ্যালগি কন্ট্রোলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে এই তিনটি মিনারেল প্রয়োজন হয়। (N) নাইট্রোজেন, (K) পটাশিয়াম এবং (P) ফসফরাস।
সেকেন্ডারি ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস্ (Mg) ম্যাগনেসিয়াম (Ca) ক্যালসিয়াম এবং (S) সালফার।
মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস/ট্রেস এলিমেন্টস (TE)—গাছের বেঁচে থাকার জন্য এই ট্রেস এলিমেন্টস্গুলি সবই প্রয়োজন (Fe) আয়রন, (B) বোরন, (Mg) ম্যাঙ্গানিজ, (Zn) জিঙ্ক, (Mo) মলিবড্নাম, (Cu) কপার, (Ni) নিকেল।

অপটিমাল ওয়াটার কলম্ নিউট্রিয়েন্টস্ লেবেল উইকলি টার্গেট রেঞ্জেস (PPM) এন্ড নিউট্রিয়েন্টস্ সোর্স

কার্বন— (C) CO_2 ইনজেকশন- ৩০PPM Co_2।

নাইট্রোজেন (N/NO_3,NH_4) -সোর্স KNO_3 মাছের ওয়েস্ট, প্ল্যান্ট ডিকেই 5-10 PPM আপটু 30PPM (হাইলাইট ট্যাঙ্কের জন্য) ডোজিং এপ্রোক্স 1PPM ডেইলি।

ফসফরাস (P/PO_4) সোর্স KH_2PO_4, মাছের ওয়েস্ট, প্ল্যান্ট ডিকেই, কলের জল— 0.1-1PPM– আপ টু 3PPM (হাইলাইট ট্যাঙ্কের জন্য) ডোজিং 1/10 নাইট্রেট লেবেল— এপ্রোক্স 0.1 PPM ডেইলি যে অ্যাকোরিয়ামের ফিস্ লোড কম সেখানে ফসফরাস ডোজিং বাড়াতে হবে।

পটাশিয়াম ($K/K+$) সোর্স K_2SO_4, KNO_3, KH_2PO_4-5-20 PPM ডোজ্ এপ্রোক্স 1.33 PPM ডেইলি।

ম্যাগনেসিয়াম ($Mg/Mg2+$) সোর্স, $MgSO_4$কলের জল, সাবস্ট্রেট - 5-10PPM

ক্যালসিয়াম (Ca/Ca_2) সোর্স $CaSO_4$ কলের জল, সাবসট্রেট—20-30 PPM

ট্রেস এলিমেন্ট (Fe, Mn, B, Zn, Mo, Cu,N) সোর্স EDTA মাইক্রো মিক্স) 0.05 PPM-0.2 PPM

নিউট্রিয়েন্ট ব্যালান্স এন্ড ডেফিসিয়েন্সি, নিউট্রিয়েন্ট মোবিলিটি এক্সেস ফসফরাস গাছেদের জিঙ্ক আপটেক কমিয়ে দেয়।

এক্সেস পটাশিয়াম গাছেদের ম্যাগনেশিয়াম আপটেক কমিয়ে দেয় এবং ভাইস ভার্সা।

এক্সেস ক্যালসিয়াম গাছেদের বোরন ও ম্যাগনেসিয়াম ডেফিসেনসি তৈরি করে। বেশি মাত্রায় NO_3 এবং PO_4, মাইক্রো আর ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টসের ব্যালেন্স তৈরি করে এবং মেটাল টকসিসিটির রিস্ক কমায়। যখন হাই কনসেনট্রেশনের ট্রেস এলিমেন্টস ডোজিং করা হয়।

কমমাত্রায় বা বেশি মাত্রায় নিউট্রিয়েন্টস যদি অ্যাকোরিয়ামে থাকে এবং অ্যাকোরিয়াম যদি মেন্টেনেন্স না করা হয় বা যথেষ্ট পরিমাণে লাইট এবং CO_2 যদি না থাকে তাহলে ঠিকমতো নিউট্রিয়েন্টস্ অ্যাবসর্ভ না হওয়ার ফলে অ্যাকোরিয়ামের টক্সিসিটি এবং অ্যালার্জি বৃদ্ধি পায়। অ্যাকোরিয়ামে যখন যথেষ্ট পরিমাণে নিউট্রিয়েন্টস্ থাকে, গাছপালা যখন হেলদি থাকে এবং পুরো ইকোসিস্টেমস যখন ব্যালেন্সড্ থাকে তখন অ্যাকোরিয়ামে অ্যালার্জি বৃদ্ধি পায় না এবং সম্পূর্ণ ভাবে চলে যায়। (মূলত নাইট্রোজেন এবং ফসফেট ব্যালেন্স যদি ঠিকমতো মেন্টেন করা যায় মাছে ওয়েস্ট, প্ল্যান্টডিকে এবং ফার্টিলাইজার ব্যালেন্স রাখতে গেলে নিয়মিত ওয়াটার চেঞ্জ করা দরকার।

গাছের যখন নাইট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন গাছের পাতার মধ্যিখানের শিরার থেকে হলুদ হয়ে যায় (ক্লোরোফিল), এক্ষেত্রে পাতার টিক থেকে ধীরে ধীরে গাছের স্টেমের দিক পর্যন্ত হলুদ হতে থাকে, নতুন পাতার গ্রোথ স্লো হয়ে যায় এবং পুরনো পাতাগুলি হলুদ হয়ে খসে যায়।

গাছের যখন ফসফরাস ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন গাছের পাতা মার্জিন বা পাতার এজ থেকে লালচে বা পারপেল কালার হয়ে যায়, গাছের গ্রোথ থেমে যায়, গাছের শিকড়ের গ্রোথ ও থেকে যায় এবং অ্যালার্জিতে ভরে যায়।

গাছের যখন পটাশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন গাছের পাতা মার্জিন বা এজ এবং পাতার শিরা থেকে হলুদ হয়ে যায়, নতুন পাতারগুলো কুঁচকে যায় এবং ছোট ছোট ফুটো পাতার মধ্যে দেখা যায়।

গাছের যখন ম্যাগনেসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন গাছের পুরনো পাতার ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং গাছের গ্রোথ স্লো হয়ে যায় গাছের যখন ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন গাছের নতুন পাতা ফ্যাকাসে হয়, গ্রোথ খুব স্লো হয়ে যায়, নতুন পাতা কোঁচকানো হয়, পাতা ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং গলে যায়।

মোবিলিটি— গাছের নিউট্রিয়েন্টস মোবিলিটি নির্ধারণ করে প্রথম ডেফিসিয়েন্সি সিম্পটজ কোথায় দেখা যাবে।

মোবাইল—যে নিউট্রিয়েন্টস্গুলো মোবাইল সেই নিউট্রিয়েন্টসগুলি পুরনো পাতার থেকে নতুন গ্রোথ পোরসনেতে মুভ করে যার ফলে পুরনো পাতাগুলিতে ডেফিসিয়েন্সি দেখা যায়।

নাইট্রোজেন, ফসফরাস (কিছুটা মোবাইল) পটাশিয়াম (প্রচণ্ড মোবাইল), ম্যাগনেসিয়াম (কিছুটা মোবাইল) এবং সালফার।

ইমমোবাইল— এই নিউট্রিয়েন্টস্গুলি গাছের পুরনো পোরসন থেকে গাছের নতুন পোরসনেতে মুভ করতে পারে না তাই এই নিউট্রিয়েন্টসগুলো ডেফিসিয়েন্সি নতুন গ্রোথ পোরসনেতেই দেখা যায়।

ক্যালসিয়াম, বোরন, কপার, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, মলিবডিনাম।

ANIMAUX AQUATIQUES

Believe in quality not in quantity

‖ Malawi cichlid ‖ Tanganyikan cichlid ‖ Central American ‖ South American ‖

Wholesale & Retail

Contact details:8910296663

Animaux Aquatiques
@animauxaquatiquesstore

কৃতজ্ঞতা

বাংলা ও বাঙালীর প্রথম জলজ প্রকৃতি ও মাছ সংক্রান্ত ষান্মাসিক পত্রিকা ‘মেছোবই’ এর প্রকাশ পাওয়া এ যাবৎ প্রতিটি সংখ্যাতেই ‘মেছোবই’ কে ভালোবেসে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসছেন একাধিক শুভানুধ্যায়ী। এই সংখ্যাও তার ব্যতিক্রম নয়। ‘মেছোবই’ এর উন্নতিকল্পে অনুদান দেওয়া এবং ‘মেছোবই’ এর পাতায় বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রত্যেককে আমরা জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। শুধু এনারাই নন, প্রতিবার ‘আগামীর মেছো’ র পাতায় অংশ নেওয়া সকল উৎসাহী খুদে মৎস্যপ্রেমীদের প্রতিও আমরা জানাই আন্তরিক ভালোবাসা। তোমাদের ভালোবাসাই পৃথিবীকে আবার নবজাতকের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে পারে। আর এই সংখ্যায় আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই স্বনামধন্য শিল্পী তৌসিফ হক মহাশয় কে যিনি গত সংখ্যা থেকে আমাদের পাশে থেকে আমাদের উৎসাহ দান করছেন, আমাদের তাঁর আঁকা ছবি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। সবার এই ভালোবাসা আর পাশে থাকাটুকুর ইচ্ছেই গড়ে উঠুক ‘মেছোবই’ এর প্রাসাদ। আমরা ‘মেছোবই’ এর প্রতিটি সংখ্যায় আপনাদের ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো। ধন্যবাদ সকলকে। পাশে থাকবেন, সাথে থাকবেন, ভালো লাগলে ‘মেছোবই’ ছড়িয়ে দেবেন সকলের মধ্যে।